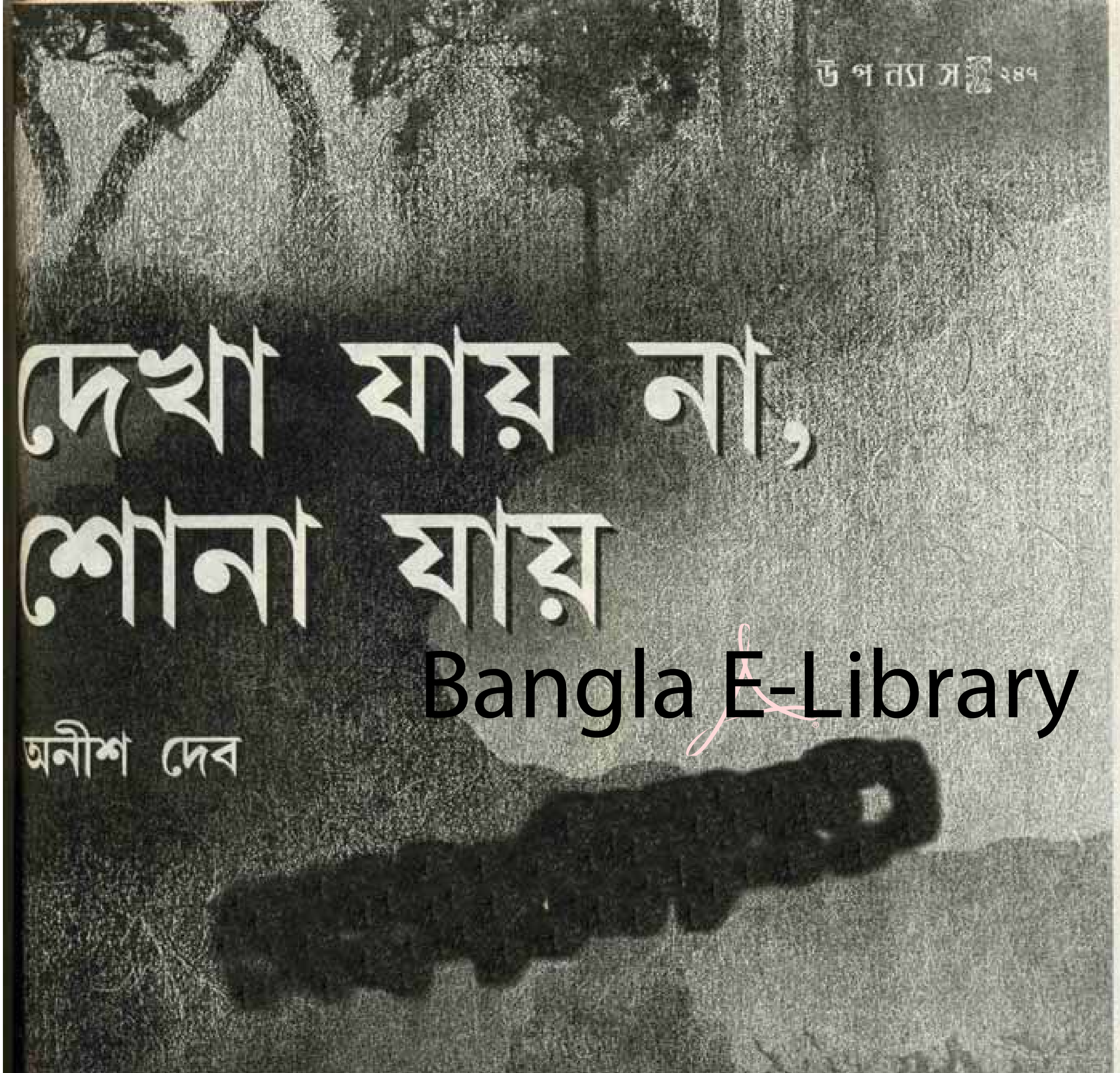


দেখা যায় না, শোনা যায়

অনীশ দেব

টিভির 'রেনবো' চ্যানেলের একটা প্রোগ্রাম প্রিয়নাথ জোয়ারদারকে খুব টানে। প্রতি সপ্তাহে প্রিয়নাথ নিয়ম করে এটা দেখেন।

প্রোগ্রামটার নাম 'তেনারা যেখানে আছেন'। সারা ভারতে কোথায়-কোথায় ভূত-প্রেতের আস্তানা এবং সেখানে ঠিক কী ধরনের ভূতুড়ে ব্যাপার-স্যাপার ঘটে বলে স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস, সেসব নিয়েই জমকালো রুদ্ধশ্বাস প্রেজেন্টেশান।

এই উইকলি প্রোগ্রামটা দেখার সময় প্রিয়নাথ নোটবই আর পেন নিয়ে বসেন। যখনই মনে হয় তখনই নিজের মতো করে নোট নেন। আর তারই ফাঁকে-ফাঁকে সিগারেটে টান।

প্রোগ্রামটার ভৌতিক ব্যাপারগুলোও ভারী বিচিত্র।

তামিলনাড়ুর কোন গ্রামে নাকি একটা বটগাছ রাতে কথা বলে, ভবিষ্যদ্বাণী করে। লখনউয়ের কোন এক রাস্তায় একটা বিশেষ জায়গায় গিয়ে টাঙ্গা সবসময় উলটে যায়।

উড়িষ্যার একটা পোড়োবাড়ির সামনে রাতে যদি কেউ যায় তা হলে শোঁ-শোঁ শব্দে বাতাসের ডাক শুনতে পায় আর তার সঙ্গে সমুদ্রের ঢেউ ভাঙার শব্দ। যদিও সমুদ্র সেখান থেকে সাড়ে চার কিলোমিটার দূরে।

বিহারের একটা রাজপ্রাসাদের মাপের প্রকাণ্ড বাড়ি নাকি ভারী অদ্ভুত। বহুযুগের পুরোনো ভাঙাচোরা ফাটল-ধরা ওই বাড়িটা থেকে প্রায়ই নানান অংশ খসে পড়ে। সেই খসে পড়া টুকরোগুলোর চেহারা মানুষের। মানে, এক-একটা টুকরো এক-একটা ভাস্কর্য—মানুষের নানান ভঙ্গিমার মূর্তি।

আজও রাত ন'টায় টিভি খুলে 'রেনবো' চ্যানেল চালিয়েছেন। মনোযোগী ছাত্রের মতো নোট নিচ্ছেন, সিগারেটে টান দিচ্ছেন, তখনই পাশের টেবিলে রাখা মোবাইল ফোন বেজে উঠল।

সিগারেট বাঁ-হাতে নিয়ে ডানহাতে ফোন তুললেন প্রিয়নাথ। 'অ্যাকসেপ্ট' বোতাম টিপলেন।

'হ্যালো, প্রিয়নাথ বলছি—।'

'ভূতনাথদা? আমি মিংকি বলছি—।'

অমনি গলার স্বর পালটে গেল প্রিয়নাথের ঃ 'বলো, কী খবর? ঘরে বসে তোমাদের "তেনারা" প্রোগ্রামটা দেখছি...।'

মিংকি তেওয়ারি 'রেনবো' চ্যানেলের সাংবাদিক। 'তেনারা যেখানে আছেন' প্রোগ্রামটার কনসেপ্ট ওরই। তা ছাড়া এই প্রোগ্রামটা মিংকি আর ওর দুজন কলিগ মিলে প্রোডিউস করছে।

প্রিয়নাথ মিংকিকে প্রায় বছর চারেক ধরে চেনেন। বছর পঁচিশের মিষ্টি মেয়ে। খুব চনমনে আর এনার্জিটিক। গত দু-বছরে দুবার ভূতনাথের টিভি ইন্টারভিউ নিয়েছে। প্রথম ইন্টারভিউর পর থেকেই আলাপটা গাঢ় হয়ে গেছে।

প্রিয়নাথ নিজে যখন পঁচিশ কি ছাব্বিশ, তখন থেকেই ভূতচর্চায় মেতেছেন। ভূত-প্রেতের খোঁজ করে-করে তিন দশকের বেশি সময় কাটিয়ে দিয়েছেন। তাই সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে কী করে যেন ওঁর শৌখিন নামটা পালটে গিয়ে 'ভূতনাথ' হয়ে গেছে। ওঁর কাছের মানুষরা ওঁকে সবসময় ভূতনাথ বলে ডাকে। মিংকিও তাই।

'মিংকি, তোমার প্রোগ্রাম কিন্তু দারুণ হচ্ছে। একইসঙ্গে ইন্টারেস্টিং আর ইনফরমেটিভ। দেখবে, তোমার "তেনারা" তাঁদের টি-আর-পি চড়াতে-চড়াতে কোথায় নিয়ে যান! কনগ্রাট্স, মিংকি...!'

প্রিয়নাথ একতরফা কথা বলে যাচ্ছিলেন। হঠাৎই যেন খেয়াল করলেন মিংকি বেশ চুপচাপ, অথচ মেয়েটা অনেক কথা বলে, দারুণ কথা বলে।

'কী ব্যাপার, মিংকি?' প্রিয়নাথের গলায় উদ্বেগ।

'আর ব্যাপার—' ফোঁস করে একটা শ্বাস ছাড়ল মিংকি ঃ 'ভূতনাথদা, আমার প্রোগ্রামের টি-আর-পি জিরো হতে চলেছে। কারণ, বোধহয় নেক্সট উইক থেকে প্রোগ্রামটাই আমাদের প্রোডাকশন হাউস বন্ধ করে দেবে।'

'কেন? কেন?' অ্যাশট্রেতে হাতের সিগারেটটা গুঁজে দিলেন। টিভির প্রোগ্রামের দিক থেকে চোখ সরে গেল।

'কেন আবার! কলকাতার একটা র‍্যাশনালিস্ট সোসাইটি—নাম "যুক্তিবাদ প্রসার সমিতি"—তার সেক্রেটারি বেশ ভালোরকম থ্রেট দিয়ে আমাদের চ্যানেলে একটা চিঠি দিয়েছে। তাতে লিখেছে কি যদি আমরা এই প্রোগ্রামের সাপোর্টে কোনও প্রুফ না দিতে পারি, তা হলে পাবলিককে ব্লাফ দেওয়ার জন্যে, মিসলিড করার জন্যে, সাদা কথায় বোকা বানানোর জন্যে সে কোর্ট থেকে ইনজাংশান অর্ডার বের করবে, কোর্টে কেস ঠুকবে।

'আমাদের চ্যানেলের ডিরেক্টার আমাকে ডেকে বলেছেন, সাপোর্টিং প্রুফ খুঁজে বের করতে। এবং জলদি বের করতে। সো ভূতনাথদা, প্লিজ সেভ মি। য়ু ফাইন্ড আউট সাম ব্লাডি প্রুফ ফর মি। যেমন করে হোক এই প্রসার সমিতিকে ঠেকান।'

শেষদিকে মিংকির কথাগুলো আর্ত অনুনয়ের মতো শোনাল।

ভূতনাথের খুব খারাপ লাগছিল। ভূত আছে কি নেই, এই প্রশ্নের উত্তর নিয়ে সংশয় অসংশয়ের দোলা চিরকালের। এই প্রশ্নের উত্তরে ভূতনাথ যেটা বলেন সেটা হল ঃ ভূত হল ছোটবেলায় পড়া জ্যামিতিক বিন্দুর সংজ্ঞার মতো। বিন্দুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা বেধ নেই, কিন্তু অবস্থিতি আছে। অর্থাৎ, মাপা না গেলেও তার অস্তিত্ব আছে। তেমনি বিজ্ঞান বা যুক্তি দিয়ে মাপা না গেলেও ভূতের অস্তিত্ব আছে।

'যুক্তিবাদ প্রসার সমিতি'-র ওই সম্পাদক বিজ্ঞান আর যুক্তি দিয়ে মেপেই প্রমাণ করতে চান যে, ভূত বলে কিছু নেই!

মনে-মনে হাসলেন প্রিয়নাথ। যুক্তিবাদের গুরুমশাই ওই সম্পাদকের সঙ্গে দেখা হলে প্রিয়নাথ সবিনয়ে জানতে চাইবেন, ভগবানের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য বিজ্ঞানসম্মত কোনও মহান কায়দা তাঁর জানা আছে কি না।

'ও.কে., মিংকি—তুমি একটা কাজ করো। কাল সকাল এগারোটা নাগাদ তুমি আমার বাড়িতে আসতে পারবে?

'অফ কোর্স পারব!' তড়িঘড়ি বলে উঠল মিংকি, 'ডিরেক্টারকে খুশ না করতে পারলে আমাকে অন্য চ্যানেলে নোকরির জন্যে লাইন লাগাতে হবে। কাল এগারোটাতেই আসব। শার্প।'

'তা হলে শোনো, তুমি সঙ্গে কী-কী নিয়ে আসবে। তোমার প্রোগ্রামটার সবক'টা এপিসোডের ডিভিডি—যেগুলো টেলিকাস্ট হয়েছে সেগুলো, আর যেগুলো এখনও টেলিকাস্ট হয়নি, কিন্তু হবে—সেগুলোও। মানে, টোটাল সিরিজটার ডিভিডি নিয়ে আসবে।'

'ও. কে.। আর কী আনব বলুন—?'

'ওই র‍্যাশনালিস্ট সোসাইটির সেক্রেটারির চিঠির একটা জেরক্স কপি—ব্যস, আর কিছু লাগবে না।'

'ওঃ, খুব হালকা লাগছে। ভূতনাথদা, থ্যাংক য়ু সো মাচ। সি য়ু টুমরো—।'

ফোন ছেড়ে দিল মিংকি।

প্রিয়নাথ আবার 'তেনারা যেখানে আছেন' প্রোগ্রামটায় মনোযোগ দিলেন।

প্রোগ্রামটায় যথেষ্ট মেটিরিয়াল আছে। এটার জন্য মিংকিরা প্রচুর হোমওয়ার্ক করেছে, লেগওয়ার্ক করেছে, বাড়াবাড়িরকমের খেটেছে। প্রতিটি এপিসোডের ভূতুড়ে জায়গায় গিয়ে অন লোকেশান শুট করেছে, লোকাল লোকজনের বাইট নিয়েছে। তারা কথা বলেছে যার-যার নিজের ভাষায়। কিন্তু মিংকিদের প্রোগ্রামে সেইসব কথার বাংলা অনুবাদ টিভির পরদায় পাশাপাশি ফুটে উঠেছে, তারপর ধীরে-ধীরে স্ক্রোল করে গেছে।

নাঃ, মানতেই হবে, মিংকিদের প্রোগ্রামটা বেশ কনভিন্সিং। আর সেইজন্যই তো প্রিয়নাথ জোয়ারদার সেই প্রোগ্রাম দেখে নিয়মিত নোট নেন!

প্রোগ্রামটা শেষ হয়ে গিয়েছিল। তার জায়গায় অন্য একটা সিরিয়াল শুরু হয়ে গেছে। প্রিয়নাথ আনমনা হয়ে টিভির পরদার দিকে তাকিয়ে রইলেন। অথচ কিছুই দেখছিলেন না। ওঁর মাথায় মিংকির সমস্যাটা ঘুরে বেড়াচ্ছিল। মনে-মনে তার একটা সমাধান খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন।

২

ঠিক এগারোটায় কলিংবেলের টুং-টাং শব্দ হল।

প্রিয়নাথ একটা বই পড়ছিলেন ঃ ডাড্‌লি রাইটের লেখা 'দ্য বুক অফ ভ্যাম্পায়ার্স'। ১৯২৪ সালে ছাপা সেকেন্ড এডিশান। কলিংবেলের শব্দ পেয়ে হাতের বইটা বন্ধ করলেন।

দরজা খুলতেই সামনে মিংকি তেওয়ারি। হাতে একটা বড়সড় প্লাস্টিকের প্যাকেট।

ফরসা, বয়কাট চুল, ছোট অথচ টানা চোখ, নাক একটু ছড়ানো,

চোখের কোণে হাসির ছোঁয়া। সবমিলিয়ে বেশ সুন্দর দেখতে।

মিংকির পায়ে ব্লু জিন্‌স। গায়ে হালকা ব্লু টপ—রাউন্ড নেক, এবং বেশ আঁটোসাটো। টপের ওপরে বেশ কায়দা করে গাঢ় নীল রঙে লেখা ঃ আই অ্যাম নট ফর সেল।

ওর বাঁ-হাতে একটা সিনথেটিক ব্যাঙ্গল আর কানে হোয়াইট মেটালের দুটো ফুল।

'এসো, ভেতরে এসো—।' ওকে স্বাগত জানালেন প্রিয়নাথ।

প্রিয়নাথের আস্তানা উত্তর কলকাতার রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিটের একটা পুরোনো বাড়িতে। মিংকি এ-বাড়িতে আগে অনেকবার এসেছে। তাই প্রিয়নাথের ড্রয়িংরুমের ছন্নছাড়া চেহারা ওর ভালো করেই চেনা। 'ব্যাচিলার্‌স ডেন' বলতে যা বোঝায় ঘরটা চরিত্রে ঠিক তাই। একদিকের দেওয়ালে গাদা-গাদা বই ঠাসা। সেই তাক 'হাউসফুল' হয়ে যাওয়ায় বই এসে জড়ো হয়েছে একটা টেবিলে, টেবিল থেকে চেয়ারে, আর সবশেষে মেঝেতে।

একটা পুরোনো সোফার এক কোণে প্রিয়নাথ বসেছিলেন। পরনে বাদামি-সাদা স্ট্রাইপড্‌ হাফশার্ট আর সাদা পাজামা। ডার্লি রাইটের বইটা মাঝ-পাতায় উপুড় করে সোফায় রেখেছেন। মিংকিকে সোফার অন্য কোণটা দেখিয়ে বললেন, 'বোসো, মিংকি। যতটা পারো কমফোর্টেব্‌ল হও।'

মিংকি চটপট গিয়ে সোফায় বসে পড়ল। হাতের প্যাকেটটা পাশে রাখল। ঘরের দেওয়ালে, টেবিলে, চেয়ারে আর মেঝেতে আশ্রয় নেওয়া বইয়ের সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ভূতনাথদা, ভূত ধরার কাজটা খুব পেইনফুল, না? এত্ত বই পড়তে হয়! নোবডি উইল বিলিভ ইট...।'

প্রিয়নাথ ছোট্ট করে হাসলেন। বললেন, 'সব কাজই পেইনফুল, মিংকি। নো পেইন, নো গেইন...।'

মিংকি খিলখিল করে হেসে ফেলল, বলল, 'ওয়েল সেইড।'

ওর দিকে তাকিয়ে প্রিয়নাথের একটা গানের লাইন মনে পড়ল ঃ 'আমি চঞ্চল ঝরনাধারা...।'

মিংকিকে সামনাসামনি কিংবা টিভিতে যখনই দেখেন তখনই মনে হয় ওর 'জাগিয়া উঠেছে প্রাণ'। কিন্তু আজ ঝরনাধারার গতি কিংবা প্রাণ জেগে ওঠার তেজ বেশ স্তিমিত বলে মনে হল।

ওকে একটু বসতে বলে প্রিয়নাথ ভেতরের ঘরে গেলেন। একটু পরেই একটা প্লেটে দুটো সন্দেশ আর একগ্লাস জল নিয়ে এলেন। একটা টি-টেবিলের ওপরে প্লেট আর গ্লাস রেখে টেবিলটা টেনে এগিয়ে দিলেন মিংকির কাছে। বললেন, 'খেয়ে নাও। ঠাকুরের প্রসাদ—।'

মিংকি একবার ভূতনাথের মুখের দিকে তাকাল শুধু। ও জানে এই অদ্ভুত মানুষটা আত্মা এবং প্রেতাত্মা—দুটোকেই বিশ্বাস করে। ঠাকুরের পুজোপাঠ ওঁর রোজকার নিয়ম। তার সঙ্গে ভূত-প্রেতচর্চাও।

সন্দেশ দুটো খেতে-খেতে বাঁ-হাতে প্লাস্টিকের প্যাকেটটা প্রিয়নাথের দিকে এগিয়ে দিল মিংকি। জড়ানো গলায় বলল, 'চারটে ডিভিডি আছে। সিরিয়াল নাম্বার দেওয়া আছে। আর ওই র‍্যাশনালিস্ট লোকটার চিঠির কপি—।'

প্রিয়নাথ প্যাকেটের ভেতরে উঁকি মেরে দেখলেন। তারপর হাত ঢুকিয়ে চিঠিটা বের করে নিলেন। প্যাকেটটা পাশে রেখে চিঠিটা পড়তে শুরু করলেন।

মিংকি তখন জলের গ্লাস শেষ করে প্রিয়নাথের ঘরটাকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখছিল।

জোড়াতালি দেওয়া ড্যাম্প ধরা দেওয়াল। তার সাদা রঙের আস্তর অনেক জায়গা থেকেই খসে পড়েছে। ঘরের সিলিং-এ কড়ি-বরগা—লোহা আর কাঠের তৈরি। কোথাও-কোথাও রং চটে গিয়ে লোহায় জং ধরে গেছে। সেই ব্যাকগ্রাউন্ডে পুরোনো বুড়ো সিলিং ফ্যানটাও দিব্যি মানিয়ে গেছে।

যে-সোফাটায় মিংকি বসে আছে তার ঠিক মুখোমুখি একটা রঙিন এল. সি. ডি. টিভি। আর তার পাশে একটা পুরোনো জমকালো স্টাইলের খাটো আলমারি—পালিশ করা কাঠ দিয়ে তৈরি এবং তার পাল্লায় একটা আয়না বসানো।

ঘরটা থেকে কেমন যেন একটা পুরোনো-পুরোনো গন্ধ বেরোচ্ছিল—ন্যাপথালিন, ব্লিচিং পাউডার আর বাঁধাকপি সেদ্ধর গন্ধ মেশানো।

মিংকি বলল, 'ঘরটার একটু ফেস লিফ্‌ট করাতে পারেন না! কেমন ব্যাকডেটেড.....পুরোনো.....। এখানে ভূত-টুত থাকলে আমাদের প্রোগ্রামটায় দিব্যি ফিট করে যেত।'

'উঁ?' বলে চিঠিটা থেকে মুখ তুললেন প্রিয়নাথ। একটু হেসে বললেন, 'দ্যাখো, মিংকি— এ-ঘরে একমাত্র ওই টিভি আর ডিভিডি প্লেয়ার ছাড়া সবই বেশ পুরোনো। তার মধ্যে এই লোকটাও কিন্তু আছে—' বলে নিজের বুকে বুড়ো আঙুল ঠুকলেন।

'পুরোনো' লোকটাকে খুঁটিয়ে দেখল মিংকি।

কপালটা ওপরদিকে বাড়তে-বাড়তে বেশ বড়সড় টাকের চেহারা দিয়েছে। তার দুপাশে কানের ওপরটায় কয়েক খাবলা চুল—কাঁচা-পাকা। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। তার ঠিক ওপরেই কপালে কয়েক লাইন স্থায়ী ভাঁজ। কান দুটো মাপে বেশ বড়। নাকটাও খড়্গা টাইপের।

প্রিয়নাথ জোয়ারদারের চেহারা এমনিতে ফরসা, সৌম্যকান্তি। তবে তারই মধ্যে ব্যক্তিত্বের জোরটা কীভাবে যেন স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। বয়েস ষাটের কাছাকাছি হলেও চেহারা আর স্বাস্থ্য দেখে অনেকটা কম বলে মনে হয়।

'টিভি আর ডিভিডি প্লেয়ারটা নতুন কেন? আগের টিভিটা কোথায় গেল?' ঘাড় বাঁকিয়ে জেদি মেয়ের গলায় জানতে চাইল।

'নতুন তার কারণ পুরোনো বেঢপ টিভিটা দেড়মাস আগে খারাপ হয়েছে বলে। আর আমার কাজের জন্যে ডিভিডি প্লেয়ার ছাড়া বড্ড অসুবিধে হচ্ছিল। যেমন, এই তোমার প্রবলেমটাই ধরো না—' বাঁ-হাতটা শূন্যে নাড়লেন প্রিয়নাথ ঃ 'যাকগে, এসব গোয়েন্দা-মার্কা কোশ্চেন বাদ দাও। এখন বলো তো, এই র‍্যাশনালিস্ট সোসাইটির সেক্রেটারির হুমকির ব্যাপারটা কী করবে?'.

'ও মাই গশ! আমি কী করব? করবেন তো আপনি—' চোখ বড়-বড় করে বলল মিংকি।

'ও—' চিঠিটা হাতে নিয়ে চোখ বুজলেন প্রিয়নাথ। ভাবনার মধ্যে ডুবে গেলেন কিছুক্ষণ।

তারপর চোখ খুলে তাকালেন চিঠিটার দিকে। র‍্যাশনালিস্ট সোসাইটির লেটারহেডে ছাপা চিঠি। বেশ জঙ্গি ভাষায় লেখা। নীচে সই রয়েছে এবং লেখকের নামও ছাপানো আছে ঃ রমাশঙ্কর দত্ত।

'এই রমাশঙ্কর দত্ত লোকটা কীরকম?'

'আমার একদম পছন্দ নয়—' ঠোঁট ওলটাল মিংকি ঃ 'কথাবার্তা বলে খুব বাজে ভাবে। মনে লাগে কি আমার বসের চেয়েও বড় কর কুছ। খালি হুকুম আর হুমকি...।'

'মিংকি, চিঠিটা পড়ে আমার মনে হচ্ছে এর হুমকিগুলো ফাঁকা আওয়াজ নয়। সত্যি-সত্যি যদি তুমি সাপোর্টিং প্রুফ জোগাড় করতে না পারো তা হলে তোমার প্রোগ্রাম ও শিকেয় তুলবে।'

'শিকেয় তুলবে?' অবাক হয়ে ভূতনাথের দিকে তাকাল মিংকি ঃ 'শিকেয় মানে কী?'

হেসে ফেললেন প্রিয়নাথ। 'শিকেয়' শব্দটার অর্থ মিংকি তেওয়ারি বুঝতে পারেনি। তাই খোলসা করে বললেন, 'প্রুফ জোগাড় করতে না পারলে তোমার প্রোগ্রামের চ্যাপ্টার ক্লোজ্‌ড হয়ে যাবে।'

মিংকি একটু গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর হঠাৎই আশা ভরা চোখে তাকাল ভূতনাথের দিকে। এক ঝলক হেসে বলল, 'আপনি তো প্রুফ জোগাড় করে দিচ্ছেন! এ ব্যাপারে আপনি ফেমাস। য়ু আর দ্য গ্রেটেস্ট।'

প্রিয়নাথ একটু হাসলেন। কিন্তু মনে-মনে তখনও নানান কথা

ভাবছিলেন, সমস্যা সমাধানের একটা পথ খুঁজছিলেন।

'আচ্ছা, মিংকি, তোমাদের এই প্রোগ্রামটায় কলকাতা বা ওয়েস্ট বেঙ্গলের কোনও ভুতুড়ে বাড়ি-টারি দেখানো হয়নি?'

'আছে, তবে এখনও টেলিকাস্ট হয়নি। পসিব্‌লি তিন-চারটে এপিসোড পরে আছে।'

'গুড। সেটাই হবে আমাদের ফোকাস।' প্রিয়নাথ চিঠিটা শূন্যে দুবার নাড়লেন। তারপর : 'আমি আজ রাতের মধ্যে সবক'টা এপিসোড দেখে রাখছি। তারপর তোমাকে ফোন করে আমার ওপিনিয়ান দেব।'

'কিন্তু আপনি কি কোনও লাইন অফ অ্যাকশান ভেবেছেন?'

চিঠিটা সোফায় নামিয়ে রেখে ভূতনাথ বললেন, 'ভেবেছি। ওয়েস্ট বেঙ্গলের যে-এপিসোডটা তোমার সিরিয়ালে আছে সেটা আমি ইনভেস্টিগেট করে দেখব। যদি প্রুভ করতে পারি যে, ব্যাপারটা জেনুইন তা হলে তুমি জিতবে, রমাশঙ্কর হারবে। আর যদি ভূত-প্রেতরা আমাকে দেখা না দেয় তা হলে ব্যাড লাক। রামাশঙ্কর উইন্‌স—য়ু লুজ।'

'ইমপসিব্‌ল। কারণ, আমাদের চ্যানেলের টিম খুব জেনুইন। ওরা খুব অনেস্টলি কাজ করেছে। তা ছাড়া "রেনবো" এই প্রোডাকশানটার জন্যে বহত টাকা ইনভেস্ট করেছে—।' ব্যাপারটা জোর দিয়ে বোঝানোর জন্য বাতাসে হাত নাড়ল মিংকি : 'আমি বলছি আপনি প্রুভ করতে পারবেন।'

প্রিয়নাথ গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়লেন। ছোট্ট করে বললেন, 'হুঁ—।'

'আমি তা হলে আপনাকে কবে ফোন করব?' প্রশ্নটা করেই উঠে দাঁড়াল মিংকি।

প্রিয়নাথ তড়িঘড়ি হাত নেড়ে ওকে বললেন, 'আরে, উঠছ কী? বোসো, বোসো। তোমাকে আমি চা করে খাওয়াব...।'

'না, ভূতনাথদা—' পকেট থেকে মোবাইল বের করে সময় দেখল : 'অফিসে ঢুকতে দেরি হয়ে যাবে...।'

প্রিয়নাথ বললেন, 'ডোন্ট ফরগেট, তুমি এখানে অফিসের কাজেই এসেছ। তা ছাড়া তোমার জন্যে চা করলে আমিও বাদ যাব না। আর তা হলেই একটা সিগারেট ধরানোর চান্স পাব—।'

'ওঃ, আপনার এই হ্যাবিটটাই বহত বাজে। সিগারেট। আপনি জানেন না, সিগারেট স্মোক করাটা ইনজুরিয়াস টু হেল্‌থ?'

'হ্যাঁ, জানি।' হেসে বললেন ভূতনাথ, 'আর সিগারেটের মতো ভূত ধরে বেড়ানোটাও তো স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর! কিন্তু মিংকি, বিলিভ মি, এ-দুটোর কোনওটাই আমি ছাড়তে পারব না। আই লাভ দেম...।'

৩

জায়গাটার নাম চপলকেতু। এরকম নামের যে কোনও জায়গা হতে পারে সেটাই প্রিয়নাথ জানতেন না। এপিসোডের শুরুতেই বড় করে টাইটেল দেখা গেল পরদায় : 'চপলকেতুর চপল ছায়া'। তার নীচেই মাঝারি হরফে লেখা : 'পশ্চিমবঙ্গ'।

সন্ধেবেলা পুজোপাঠ সেরে টিভির সামনে বসেছেন ভূতনাথ। ওঁর পাশেই একটা ছোট টেবিলে টেবিল-ল্যাম্প জ্বলছে। টেবিল-ল্যাম্পের হলুদ ঘেরাটোপে লাল বুটির নকশা।

টেবিল-ল্যাম্পের এই আলোটুকু ছাড়া ঘর অন্ধকার। ডিভিডি প্লেয়ারে মিংকি তেওয়ারির দিয়ে যাওয়া ডিভিডি চলছে। পশ্চিমবঙ্গের এপিসোডটা আরও একবার দেখছেন। হাতে প্যাড আর ডট পেন।

মিংকির দেওয়া চারটে ডিভিডি-ই প্রিয়নাথের দেখা হয়ে গেছে। সেই সকাল ন'টা থেকে দেখা শুরু করেছেন। মাঝে-মাঝে ব্রেক দিয়ে স্নান, খাওয়াদাওয়া সেরে নিয়েছেন। তারপর সব ক'টা এপিসোড দেখে শেষ করতে-করতে দুপুর সওয়া দুটো।

এপিসোডগুলো খুবই প্রফেশনালি তোলা। যেমন স্মার্ট ডায়রেকশান, তেমনই স্মার্ট সিনেমাটোগ্রাফি। এই এপিসোডগুলোকে এডিট করে খুব সহজেই বড় পরদার জন্য একটা দারুণ ছবি তৈরি করে ফেলা যায়।

দুপুরে পশ্চিমবঙ্গের এপিসোডটা দেখেছেন সাধারণ দর্শকের চোখে। এখন সেটা আবার দেখতে বসেছেন ভূতশিকারির চোখে।

এপিসোড শুরু হওয়ার পর থেকেই ধারাভাষ্য শুরু হয়ে গেল। কখনও সেটা মহিলার গলায়, কখনও-বা পুরুষের।

জায়গাটা একট গন্ডগ্রাম। বর্ধমান কর্ড লাইনের শিবাইচণ্ডীতে নেমে ভেতরদিকে আরও ন'-দশ কিলোমিটার যেতে হয়।

শুরুতে জায়গাটার নানান অংশের ফটোগ্রাফ মিক্স করে করে দেখানো হচ্ছিল—সঙ্গে ব্যাকগ্রাউন্ড এফেক্ট মিউজিক। সবমিলিয়ে গা-ছমছমে পরিবেশটা বেশ জমে উঠল।

তারপরই পরদা জুড়ে একটা রঙিন ম্যাপ দেখানো হল—পশ্চিমবঙ্গের ম্যাপ। সেই ম্যাপে দুটো বড়-বড় সিঁদুরের টিপ : একটা কলকাতা, আর একটা চপলকেতু। একটা চওড়া লাল রেখা কলকাতা থেকে চপলকেতু যাওয়ার রাস্তাটা আঁকতে শুরু করল, আর তার সঙ্গে চলতে লাগল সেই রাস্তা ধরে যাওয়ার খুঁটিনাটি বিবরণের ধারাভাষ্য। শুনলেই বোঝা যায়, ওই রাস্তা ধরে সত্যিকারে না গেলে এরকম বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়।

রাস্তার পরিচয় শেষ হল আর তার সঙ্গে-সঙ্গে ক্যামেরাও ঢুকে পড়ল গ্রামে। ট্রাভেল এজেন্সির প্রোগ্রামের মতো গ্রামের নানান জায়গা দেখানো হল, 'অফ ভয়েস'-এ দর্শককে তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল। তারপর সাংবাদিক মেয়েটিকে দেখা গেল—মাইক হাতে একটা পুরোনো মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। জানা গেল, মেয়েটি 'রেনবো' চ্যানেলের তৃষ্ণা। এই ভাঙাচোরা মন্দির—অথবা, মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ থেকেই ওর ভুতুড়ে আস্তানার অভিযান শুরু।

প্রিয়নাথ প্রোগ্রামটা দেখছিলেন আর চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছিলেন। আবার কখনও-কখনও টেবিল-ল্যাম্পের আলোয় প্যাডের কাগজে নোট নিচ্ছিলেন।

টেবিল-ল্যাম্পের পাশে ওঁর মোবাইল ফোন সাইলেন্ট মোডে রাখা ছিল। মাঝে-মাঝে ওটার আলো দপদপ করে উঠছিল, কিন্তু প্রিয়নাথ সেদিকে এখন তাকাচ্ছিলেন না। পরে সময়মতো দেখবেন, দেখে দরকারি যোগাযোগগুলো সেরে নেবেন।

তৃষ্ণা ছাড়াও আরও দুজন সাংবাদিককে ছবিতে দেখা গেল। প্রোগ্রামটার একঘেয়েমি কাটাতেই হয়তো তিনজন সাংবাদিককে ব্যবহার করা হয়েছে। ওরা ফটোগ্রাফারদের নাম বলছিল, কিন্তু তাদের দেখা যাচ্ছিল না। প্রিয়নাথ সবার নামই টুকে নিলেন। তার সঙ্গে এপিসোডে দেখানো জায়গাগুলোও নোট করে নিলেন।

এপিসোডটা সত্যিই বেশ অদ্ভুত। মিংকিরা যা-যা দেখিয়েছে সেগুলো যদি সত্যি হয় তা হলে মানতেই হবে, চপলকেতুর এই অঞ্চলটা বিচ্ছিরিরকম ভুতুড়ে।

এটা ঠিকই যে, ভৌতিক কাণ্ডকারখানাগুলো তৃষ্ণাদের চোখের সামনে ঘটেনি, আর ওদের ক্যামেরাও চলেছে শুধু দিনেরবেলায়। স্থানীয় লোকজন কোনও-কোনও ঘটনা আবছাভাবে বর্ণনা করেছে। তৃষ্ণারা সেসব কথা রেকর্ড যেমন করেছে তেমনই স্পেশাল এফেক্ট আর অ্যানিমেশান ব্যবহার করে অলৌকিক ঘটনাগুলো দর্শকদের সামনে 'জ্যান্তভাবে' তুলে ধরার চেষ্টা করেছে।

মিংকিদের প্রোগ্রামে গ্রাফিক্সের কাজ অত্যন্ত চমৎকার। ওরা প্রোগ্রামে চপলকেতুর একটা রঙিন ম্যাপও দেখিয়েছে। তাতে ভুতুড়ে বা 'হন্টেড' অঞ্চলটা লাল রঙের গণ্ডি টেনে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছে। এবং তৃষ্ণা আর ওর সঙ্গীরা বলেছে যে, খুব দায়ে না পড়লে গাঁয়ের লোকেরা ওই অঞ্চলটার ছায়া মাড়ায় না। দিনেরবেলা যদিও বা দু-চারজন ওই এলাকার ওপর দিয়ে যাতায়াত করে, রাতে কারও মাথায় ওরকম দুর্বুদ্ধি চাপে না।

এ পর্যন্ত ব্যাপারটা মোটামুটি ঠিকই ছিল, কিন্তু গোলমাল পাকিয়েছেন

ত্রলোচন সিংহ রায় নামে একজন ভদ্রলোক। তিনি ওই স্পর্শকাতর ঞ্চলেই বসবাস করেন। একা নয়—সপরিবারে। ওই এলাকার ত্করা আশি ভাগ সম্পত্তিই তাঁর। বাকি কুড়িভাগের যারা মালিক রা কখনও ভুল করেও নিজেদের মালিকানা ফলাতে যাননি। ওই ত্রলোচনই স্ত্রী আর ছেলে নিয়ে কেমন করে যেন টিকে আছেন।

মিংকিদের প্রোগ্রামের বেশিরভাগ অংশ জুড়েই রয়েছে পত্রলোচন ংহ রায়ের সাক্ষাৎকার—যদিও প্রথমটা তিনি টিভি ক্যামেরার সামনে খ খুলতে রাজি হননি। তারপর যখন বুঝেছেন ওঁর এলাকার ভূতুড়ে াণ্ডকারখানা টিভির কল্যাণে পাঁচকান হবেই তখন নিমরাজি হয়ে ন্টারভিউ দিয়েছেন।

ভদ্রলোক বলেছেন, তিনি নাকি বারো ভুঁইঞার একজন—বীর সিংহ—তাঁর বংশধর, এবং চপলকেতুর জমিদার। যদিও গ্রামের কেউই াঁকে জমিদার বলে মান্য করে না।

পত্রলোচনের বিষয়-সম্পত্তির হাঁকডাক বলতে গেলে চমকে ওঠার তো। আর ওই ভূতুড়ে এলাকায় তাঁর স্থাবর সম্পত্তিও মোটেই কম য়।

পত্রলোচনের ওই উপদ্রুত অঞ্চলের মধ্যে কী নেই! বড়-বড় থামওয়ালা চারটে বাড়ি—সবক'টাই দোতলা এবং তিনমহলা। তবে সময়ের চাপে এবং অযত্নে এখন তাদের দশমীদশা। খুব পাতলা ইটের তৈরি লোহার কড়ি-বরগাওয়ালা বাড়ি। তার সর্বত্র বট আর অশ্বত্থগাছের রমরমা। তার ফলে ঘন পাতার ফাঁকে-ফাঁকে পাখি আর বাদুড়ের আস্তানা।

চারটে বাড়ি ছাড়াও ওই বদনামী এলাকায় রয়েছে দুটো মন্দির, চারটে পুকুর, আর চণ্ডীমণ্ডপ সমেত একটা প্রকাণ্ড মাপের নাটমঞ্চ। এককালে নাকি এই নাটমঞ্চে নাচ, গান, অভিনয়ের আসর বসত—আর সেখানে অন্তত দুশো দর্শক বসানোর ব্যবস্থা ছিল।

সবমিলিয়ে পত্রলোচনের ভূত-গ্রস্ত এলাকাটাকে প্রিয়নাথ জোয়ারদারের বেশ ইন্টারেস্টিং মনে হল। তা ছাড়া আরও একটা ব্যাপার তিনি লক্ষ করলেন : মিংকিদের প্রোগ্রামটায় ভৌতিক কাণ্ডকারখানা কিছু দেখা না গেলেও কিছু-কিছু অদ্ভুত শব্দের অস্পষ্ট রেকর্ডিং শোনানো হয়েছে। এই শব্দগুলোর খুব একটা বিস্তারিত ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায়নি। অন্তত তৃষ্ণা এবং ওর দুই সহ-রিপোর্টার তাই জানিয়েছে। আরও জানিয়েছে যে, পত্রলোচন সিংহ রায়ের ধারণা পূর্বপুরুষের কোনও অভিশাপেই ওঁর এই জায়গাটা অভিশপ্ত। তবে তার জন্য এখনও পর্যন্ত কারও তেমন ক্ষয়-ক্ষতি হয়নি। শুধু দু-চারজন মানুষ নাকি ওই এলাকা থেকে রহস্যময়ভাবে লোপাট হয়ে গিয়েছে। পত্রলোচন এরকমটাই বলেছেন।

প্রিয়নাথ প্রোগ্রামটা অনেকক্ষণ ধরে 'জরিপ' করলেন। কোনও-কোনও জায়গা বারবার 'রিওয়াইন্ড' করে পরখ করলেন। ফলে সাতাশ মিনিটের ডিভিডি দেখে শেষ করতে প্রিয়নাথের প্রায় দেড়ঘণ্টা লেগে গেল। তারপর টিভি আর ডিভিডি প্লেয়ার অফ করে সোফায় গা এলিয়ে চুপচাপ বসে রইলেন। টেবিল-ল্যাম্পের আলোয় প্যাডের পাতায় লেখা নোট্স-এর দিকে অলস চোখে তাকিয়ে রইলেন।

দু-চারজন মানুষের লোপাট হওয়াটা 'তেমন ক্ষয়-ক্ষতি' নয়? আশ্চর্য! পত্রলোচন এরকমটা বললেন কেন?

নাঃ, ব্যাপারটা খতিয়ে দেখার জন্য চপলকেতু যাওয়াটা খুব জরুরি। আর সেইজন্যই মিংকির সঙ্গে একটু কথা বলা দরকার।

সোজা হয়ে বসলেন প্রিয়নাথ। প্যাড টেবিলে রেখে মোবাইল ফোনটা খুঁজতে শুরু করলেন। এই তো ছিল! কোথায় যে গেল!

ফোনটা খুঁজে পেলেন সোফার গদির খাঁজে। তারপর মিংকির নম্বর ডায়াল করলেন। মেয়েটা নিশ্চয়ই এখন অফিসে—একগাদা কাজ নিয়ে ছুটোছুটি করছে।

ফোন একবার রিং হতেই মিংকি ফোন কেটে দিল।

প্রিয়নাথ খানিকটা হতাশ হয়ে মিংকির ফোনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

মিনিট পনেরোর বেশি অপেক্ষা করতে হল না। মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল।

'হাই, ভূতনাথদা—।' মিংকি।

'হ্যাঁ—তোমাকেই ফোন করছিলাম। কয়েকটা ইমপর্ট্যান্ট কথা বলার আছে।'

'বলুন...।'

'তুমি বিজি না তো?'

'না, না—বলুন। আপনার হেল্প এখন আমার কাছে সবচেয়ে জরুরি।'

'তুমি তা হলে একটু কাগজ পেন নাও। কয়েকটা জিনিস একটু লিখে নিতে হবে...।'

দশ-বারো সেকেন্ড চুপচাপ। তারপর : 'বোলিয়ে, দাদা। আই অ্যাম রেডি...।'

'চপলকেতুর এপিসোডটা আমি ক্রিটিক্যালি স্টাডি করেছি। ব্যাপারটা থরোলি ইনভেস্টিগেট করতে হলে আমাকে চপলকেতু যেতে হবে। তার সঙ্গে তোমাকে যেতে হবে। আর "যুক্তিবাদ প্রসার সমিতি"-র সেক্রেটারি রমাশঙ্কর দত্তকেও আমাদের সঙ্গে যেতে হবে...।'

'রমাশঙ্করজি তো সেখানে গিয়ে সবকিছু ছানবিন করার জন্যে এক পায়ে খাড়া হয়েই আছে। কোত্থেকে আমার মোবাইল নাম্বার জোগাড় করে আমাকে লাস্ট চার দিনে দুবার ফোনও করেছে। বলছে কী, যদি আপনারা জেনুইন হন তা হলে আমাকে অথরাইজ করে দিন—আমি অন ইয়োর বিহাফ চপলকেতুর ব্যাপারটা ইনভেস্টিগেট করছি। বের করে দিচ্ছি জায়গাটা সত্যি-সত্যি হন্টেড না নাটকবাজি। তো আমাদের চ্যানেলের ডিরেক্টর সে-পারমিশান দেননি। আমাকে বলেছেন, যে-কোনও লোককে আমি এভাবে অথরাইজেশান দিতে পারি না। তখন আমি ডিরেক্টর স্যারকে আপনার কথা বলেছি। আপনার নাম শোনার সঙ্গে-সঙ্গে উনি "ইয়েস" বলে দিয়েছেন। তার পর আমি আপনাকে কনট্যাক্ট করেছি—তার আগে নয়।'

'মিংকি, আমি তোমাকে এই কথাটাই বলতে চাইছিলাম। লিখে নাও—তোমাদের ডিরেক্টরের কাছ থেকে আমার একটা অফিশিয়াল অথরাইজেশান দরকার।' একটু থামলেন ভূতনাথ। মিংকিকে লিখে নেওয়ার সময় দিলেন। তারপর : 'আমাদের চপলকেতু ভিজিটের ব্যাপারটা জানিয়ে চপলকেতুর নিয়ারেস্ট পুলিশ ফাঁড়িতে একটা চিঠি দিতে হবে। এ ছাড়া একই চিঠি দিতে হবে লোকাল এম. এল. এ. আর ডি. এম.-কে। এসব কাগজ চালাচালির ব্যাপার ঠিকমতো না করে রাখলে পরে ঝামেলা হতে পারে।'

নোট নেওয়া শেষ করতে মিংকি একটু সময় নিল। তারপর বলল, 'ভূতনাথদা, আমাদের প্রোগ্রামটা শুট করতে যাওয়ার সময় পারমিশান বগেরা যা কিছু সব আমিই ছুটোছুটি করে জোগাড় করেছিলাম। আমি ডিরেক্টর স্যারকে বলে এসব অ্যারেঞ্জমেন্ট কমপ্লিট করে নিচ্ছি—আপনি এ নিয়ে কোনও টেনশান নেবেন না। তবে আমার একটা সাজেশান আছে। আই হোপ, আপকা পারমিশান মিল জায়েগা।'

'কী সাজেশান? বলো—।'

'আমাদের চ্যানেল থেকে তৃষ্ণা আর বিনোদকুমারও আমাদের সঙ্গে যাবে। তৃষ্ণা—আমাদের রিপোর্টার—ওকে আপনি প্রোগ্রামটায় দেখেছেন। আর বিনোদকুমার আমাদের এক্সপার্ট ক্যামেরাম্যান। চপলকেতুর এপিসোডটা শুট করার সময় বিনোদকুমার ছিল মেইন ক্যামেরাম্যান। হোয়াট ডু য়ু সে, ভূতনাথদা?'

প্রিয়নাথ বললেন, 'ওরা গেলে আমার কোনও আপত্তি নেই। তবে আমার ইনভেস্টিগেশানের কাজে যেন কোনওরকম ডিসটার্ব্যান্স না হয়...।'

'আপ বেফিকর রহিয়ে, ভূতনাথদা—কোই ডিসটার্ব্যান্স নহি হোগা। আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি। তা ছাড়া আরও একটা প্ল্যান আমার আছে।'

'কী প্ল্যান?'

'এক্সিলেন্ট প্ল্যান।' ঝরনার শব্দে হাসল মিংকি : 'আমাদের এই ইনভেস্টিগেশানের ব্যাপারটাও বিনোদকুমার শুট করবে। সেটা থেকে এডিট করে আমরা একটা ফরটি ফাইভ মিনিট্স-এর প্রোগ্রাম বানাব। আমাদের ডিরেক্টর স্যার এই প্রোপোজালটা ও. কে. করেছেন...।' কথা শেষ করে আবার হাসল মিংকি। জিগ্যেস করল, 'আইডিয়াটা দারুণ না?'

ভূতনাথ হেসে বললেন, 'হ্যাঁ—দারুণ।'

'আমি তা হলে চপলকেতু যাওয়ার প্রোগ্রামটা সবার সঙ্গে কথা বলে বানিয়ে নিচ্ছি। একটা এ. সি. টাটা সুমো নিয়ে আমরা কলকাতা থেকে স্টার্ট দেব। স্টার্ট দেওয়ার কম সে কম দু-দিন আগে আপনাকে কনফার্ম করব, ঠিক আছে?...ও, হ্যাঁ—আর-একটা কথা।'

'কী কথা?'

'কাল কি পরশুর মধ্যে আমি মিস্টার রমাশঙ্কর দত্তকে নিয়ে আপনার বাড়িতে যাব—আপনার সঙ্গে ইনট্রোডিউস করিয়ে দেব। তা হলে আপনি ওঁর সঙ্গে সামনাসামনি সবকিছু স্ট্রেটকাট ডিসকাস করে নিতে পারবেন। তা ছাড়া স্পটে গিয়ে তো রেগুলার ডিসকাশন হবেই...।'

প্রিয়নাথ ছোট্ট করে 'হুঁ—' বললেন বটে কিন্তু ওঁর মনের মধ্যে আশঙ্কার দুলুনি শুরু হয়ে গিয়েছিল। অ্যানিমেশান আর স্পেশাল এফেক্ট এক জিনিস, আর আসল জিনিস তো আসল...!

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'ও. কে., মিংকি। তবে কীভাবে তোমার অ্যারেঞ্জমেন্ট এগোচ্ছে মাঝে-মাঝে ফোন-টোন করে জানিয়ো...।'

'অফ কোর্স জানাব...। তবে শুধু ফোন করে নয়—দেখা করেও জানাব...।'

মিংকির সঙ্গে কথা বলা শেষ করে প্রিয়নাথ ভাবতে বসলেন। হঠাৎ করে কেমন একটা ভ্যাপসা গরম টের পেলেন। হাত দিয়ে কপাল মুছলেন। একটা লম্বা শ্বাস ছেড়ে ভাবলেন, ভূত-শিকারের সরঞ্জামগুলো সব ঠিকঠাক করে গুছিয়ে নিতে হবে। তারপর দেখতে হবে চপলকেতুর চপল ছায়ার পিছনে সত্যি-সত্যি কোনও অলৌকিক ব্যাপার আছে কি নেই...।

৪

যে-ছেলেটি গাড়ি চালাচ্ছিল তার নাম বিজয় রাধে। বেঁটে, কালো, চোখ-মুখ যেন বাটালি দিয়ে খোদাই করা, কোঁকড়া চুল, কপালে চন্দনের টিপ, আর হাতে একটা স্টিলের বালা। এমন দক্ষ হাতে ও টাটা সুমোটা চালাচ্ছিল যেন ও রাজা, আর গাড়িটা প্রজা। রাস্তার অন্যান্য গাড়িকে ভ্রূক্ষেপ না করে ওর গাড়িটা মসৃণ আঁকাবাঁকা পথ ধরে ব্যালে নর্তকীর মতো সাবলীল ছন্দে বলতে গেলে একেবারে উড়ে যাচ্ছিল। শুধু চপলকেতুর কাছাকাছি আসার পর গাড়িটা এবড়োখেবড়ো ছন্দহীন রাস্তার মুখোমুখি হল, তাই গতি কমাল।

মিংকি বসেছে সামনের সিটে, বিজয় রাধের পাশে।

দ্বিতীয় সারিতে তৃষ্ণা, রমাশঙ্কর দত্ত, আর প্রিয়নাথ।

পিছনের কেবিনে ক্যামেরাম্যান বিনোদকুমার, আর ওর চারপাশে নানান ধরনের লাগেজের বোঁচকাবুঁচকি। তার মাঝে বসে ও কানে মোবাইলের ইয়ার প্লাগ গুঁজে গান শুনছে।

বেশি ঠান্ডা লাগছিল বলে মিংকি এ.সি.-টা একটু বন্ধ করতে বলেছিল। সেই সুযোগে জানলার কাচ নামিয়ে তৃষ্ণা আর মিংকির অনুমতি নিয়ে প্রিয়নাথ একটা সিগারেট ধরালেন। সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বললেন, 'মিংকি, একটা কথা তোমাদের কিন্তু আগেই বলে রাখি। ইন জেনারেল, ভূতরা কিন্তু একটু লাজুক নেচারের হয়। সহজে দেখা দিতে চায় না।'

পাশ থেকে রমাশঙ্কর মন্তব্য করলেন, 'আমাকে দেখলে তেনারা আবার একটু বেশি লাজুক হয়ে পড়তে পারেন...।'

প্রিয়নাথ পালটা খোঁচা দিয়ে বললেন, 'হুঁ। দেবতাদের দেখে অপদেবতারা একটু বেশি ভয়-টয় পাবে এটাই তো ন্যাচারাল....।' কথা শেষ করে আড়চোখে রমাশঙ্করকে দেখলেন।

মানুষটা চোয়াল শক্ত করে সামনের রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে। মুখের চেহারা দেখে মনে হয় যেন ভূতের খোঁজে নয়, কোনও জ লড়াইয়ে চলেছে।

রমাশঙ্করের লেখা চিঠিতে এই ভাবটা প্রিয়নাথ প্রথম খেয়াল করেছিলেন।

চপলকেতু রওনা হওয়ার আগে রমাশঙ্করকে নিয়ে প্রিয়নাথের বাড়িতে এসেছিল মিংকি। প্রথম পরিচয়ের পালাটা ও নিয়মমাফিক সেরে দিয়েছিল।

সেদিন আলাপ করে প্রিয়নাথের মানুষটাকে বেশ অভব্য এবং রুক্ষ মনে হয়েছিল।

প্রিয়নাথ ওঁকে জিগ্যেস করেছিলেন, 'আপনি ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করেন না?'

কপাল কুঁচকে প্রিয়নাথের দিকে তাকিয়েছিলেন রমাশঙ্কর : 'করলে কী আর "রেনবো" চ্যানেলকে ওই চিঠি লিখতাম?'

'ভগবানে বিশ্বাস করেন?'

রমাশঙ্কর বিরক্ত হওয়ার একটা শব্দ করে বললেন, 'ওঃ! আবার সেই বস্তাপচা প্রশ্ন! শুনুন, মিস্টার জোয়ারদার...ভগবান হচ্ছে একটা কনসেপ্ট। সেটা বিশ্বাস কি অবিশ্বাসের প্রশ্নের আওতার বাইরে। কিন্তু ভূতটা কোনও কনসেপ্ট নয়—স্রেফ একটা কুসংস্কার। এটা ভাঙিয়ে আজকাল অনেকেই করে খাচ্ছে...।'

স্পষ্ট খোঁচা। প্রিয়নাথ এবং মিংকির প্রতি। কারণ, সরাসরি হোক বা ঘুরপথে হোক, প্রিয়নাথ আর মিংকি ভূত ভাঙিয়েই আয় করছে।

রমাশঙ্কর দত্ত শুধু যে রুক্ষ এবং অভব্য স্বভাবের তা-ই নয়, ওঁর কথাবার্তার ঢঙে বেশ সবজান্তা গোছের হামবড়া ভাবটাও মিশে আছে।

সেইজন্যই প্রিয়নাথ আর কথা বাড়াতে চাননি।

কিন্তু রমাশঙ্কর ওঁর ব্যাগ থেকে নানান কাগজপত্র বের করে ওঁর কুসংস্কারবিরোধী অভিযানের বহুমুখী সাফল্যের সাতকাহন শোনাতে শুরু করে দিয়েছিলেন।

একটু পরেই প্রিয়নাথের মাথা ভোঁ-ভোঁ করতে শুরু করল। সম্ভবত মিংকিরও। রমাশঙ্করের কথা ঠিকঠাকভাবে ওদের দুজনের কানে ঢুকছিল না।

শেষদিকে প্রিয়নাথ শুনতে পেলেন : 'এই টিভি চ্যানেলগুলো সবচেয়ে বেশি প্রতিক্রিয়াশীল। এরা ব্যাবসার জন্যে যা খুশি তাই করতে পারে। তাই আমরা "যুক্তিবাদ প্রসার সমিতি"-র পক্ষ থেকে সবসময় ভাঁওতা আর বুজরুকির তীব্র প্রতিবাদ করি...।'

পরিস্থিতি হালকা করার জন্য প্রিয়নাথ বলেছিলেন, 'আপনার চিঠিটা কিন্তু আননেসেসারিলি অ্যাটাকিং মুডে লেখা। একটা অফিশিয়াল চিঠি...।'

প্রিয়নাথকে থামিয়ে রমাশঙ্কর উত্তর দিয়েছেন, 'মিস্টার জোয়ারদার, একটা কথা বলে রাখি। প্রোটেস্ট করতে হলে প্রোটেস্ট করার ভাষাটা জোরালো হওয়া দরকার—গলার আওয়াজ নয়। তা ছাড়া, আমার চিঠিতে গলার আওয়াজের কোনও ব্যাপার নেই। সেজন্যেই ভাষাটা একটু স্ট্রং দিয়েছি—।'

এ-কথায় মিংকি সামান্য হেসে ফেলেছিল। এতসব রুক্ষতা, অভব্যতা, সবজান্তাভাবের আড়ালে রমাশঙ্করের কথাবার্তায় কোথায় যেন একটা কমিক-কমিক ব্যাপার লুকিয়ে আছে।

পাশে বসা প্রতিবাদী মানুষটাকে লক্ষ করছিলেন প্রিয়নাথ।

বয়েস বেশি নয়—চুয়াল্লিশ কি পঁয়তাল্লিশ। বেশ ফরসা মোটাসোটা চেহারা। গালফোলা। চওড়া নাকের নীচে পুরু গোঁফ। কপালে সবসময় বিরক্তির ভাঁজ পড়ে আছে। চোখে চশমা। চশমার কাচের

ভেতর দিয়েও বোঝা যায়, চোখের নজর বেশ চোখা।

'চপলকেতুর চপল ছায়া'-র একটা সিডি রমাশঙ্কর দত্তকেও দিয়েছিল মিংকি। সেটা দেখার পর ভদ্রলোক ঘুরিয়েফিরিয়ে মিংকিকে অনেক প্রশ্ন করেছেন। কিন্তু মিংকি ছোট-ছোট 'হুঁ-হাঁ' উত্তর দিয়ে বেশিরভাগটাই এড়িয়ে গেছে। শুধু একটা কথাই বারবার বলেছে, 'আমাদের প্রোগ্রামটা শুট করার মধ্যে কিন্তু কোনও হ্যাংকিপ্যাংকি নেই, মিস্টার দত্ত। আমাদের টিম কিন্তু খুব অনেস্ট অ্যান্ড জেনুইন...। আপনি ওখানে গেলেই সব বুঝতে পারবেন...।'

তারপরেও গাড়িতে রওনা হওয়ার পর থেকে, মাঝে-মাঝেই, রমাশঙ্কর প্রশ্ন ছুড়ে দিচ্ছিলেন। কখনও মিংকিকে, কখনও তৃষ্ণাকে, আবার কখনও-বা বিনোদকুমারকে। তখনও ওরা মোটামুটি এটাই জানিয়েছে যে, স্পটে গিয়ে এসব প্রশ্ন-উত্তর পর্ব-আলোচনা করা যাবে।

পত্রলোচন সিংহ রায়ের বাড়ির কাছে যখন টাটা সুমো গিয়ে পৌঁছল, তখন বিকেল প্রায় তিনটে। কারণ, পুলিশ, এম. এল. এ. আর ডি. এম-এর অফিসে গিয়ে ফরমালিটি সারতে বেশ কিছুটা সময় গেছে। এ ছাড়া বর্ধমানে গিয়ে একটা ভদ্রগোছের হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করতেও এক-দেড় ঘণ্টা সময় লেগে গেছে।

এটা ঠিক হয়েছে যে, মিংকি, তৃষ্ণা আর বিনোদকুমার হোটেলে থাকবে। প্রিয়নাথ সেই শুরু থেকেই জেদ ধরেছেন যে, তিনি পত্রলোচনদের আস্তানাতেই মাথা গোঁজার ব্যবস্থা করবেন। সুতরাং, রমাশঙ্কর প্রিয়নাথকে একা তদন্ত করার সুযোগ দেওয়ার মতো মূর্খামি করেন কী করে! তিনিও চপলকেতুতেই থাকবেন বলে জানিয়ে দিয়েছেন।

মিংকির কাছ থেকে চপলকেতুর ম্যাপের একটা প্রিন্ট জোগাড় করেছিলেন প্রিয়নাথ। সেটা বের করে হাতে নিয়ে চলন্ত গাড়ির জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখছিলেন। তৃষ্ণা পেরিয়ে যাওয়া জায়গাগুলোর পরিচয় দিচ্ছিল। ও যেহেতু এখানে আগে এসে ঘুরে গেছে, তাই গাইডের রোল প্লে করছিল। আর বিনোদকুমার চুপচাপ বসে ছিল, গুনগুন করে গান করছিল।

চপলকেতু জায়গাটা একেবারে গ্রামস্য গ্রাম। গাছপালা, পুকুর, খড়ের চালে ছাওয়া মাটির বাড়ি—কদাচিৎ খড়ের বদলে টিনের চাল, গোরুর গাড়ি, চাষের খেত—চারপাশে শুধু এসবই চোখে পড়ছিল।

কিন্তু সেই বিশেষ সীমানা পেরিয়ে যেই মাত্র 'ভৌতিক' এলাকায় গাড়িটা ঢুকে পড়ল অমনি চারপাশের ছবিটা কেমন যেন পালটে গেল।

এতক্ষণ যে গ্রামের ছবি দেখা যাচ্ছিল, সেটা পালটে গিয়ে ছন্নছাড়া পতিত জমি আর জঙ্গলের চেহারা নিল। তারই মধ্যে কোথাও-কোথাও ভাঙাচোরা বাতিল কুঁড়েঘর চোখে পড়ছিল, তাদের ঘিরে অসংখ্য গাছপালা আর আগাছার সংসার।

ডিভিডি-তে এসব দেখেছেন প্রিয়নাথ। কিন্তু বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে যেন একটা নতুন ধাক্কা টের পেলেন।

তৃষ্ণা প্রিয়নাথকে টুকটাক ইনপুট দিচ্ছিল। বলছিল, বছর সাত-আট আগেও এই হন্টেড এলাকায় কিছু লোকজন থাকত, চাষবাস করত। কিন্তু দু-চারজন মানুষ নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার পর তারাও ধীরে-ধীরে পাততাড়ি গুটিয়ে চলে গেছে।

জানলা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখতে-দেখতে প্রিয়নাথের মনে হচ্ছিল, গোটা জায়গাটায় কেমন যেন একটা থমথমে ভাব। গাছপালাগুলো যেন কোনও কিছু হওয়ার আশঙ্কায় চুপটি করে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে।

দুটো বিশাল পুকুরের পাশ কাটিয়ে, একটা জীর্ণ মন্দির পেরিয়ে, তারপর ওঁরা যে-চীর্ণ-দীর্ণ বাড়িটায় গিয়ে পৌঁছলেন, সেটাই পত্রলোচনের বাসা।

ইট-কাঠের দাঁত-মাড়ি বের করা ছিরিছাঁদহীন একটা দোতলা বাড়ি প্রকাণ্ড কচ্ছপের মতো থেবড়ে বসে আছে। বাড়িটার সর্বত্র ছালচামড়া উঠে গেছে। আর যে-কোনও ফাটল কিংবা ফাঁকফোকর থেকে যত্রতত্র বট-অশথের গাছ বেরিয়ে এসেছে।

বাড়ির সামনে প্রকাণ্ড বড় রোয়াক। সেটা ফাটল ধরে একদিকে বেশ খানিকটা বসে গেছে। তারই মাঝামাঝি জায়গায় তিন ধাপ সিঁড়ি তার দশাও একইরকম। সিঁড়ি বেয়ে উঠলে বাড়িতে ঢোকার দরজা রোদে-জলে তার পাল্লার রং বলে আর কিছু নেই। চিড় ধরা পাল্লায় আপাদমস্তক শিরার দাগ প্রকট।

রকের লাগোয়া জমিটা এবড়োখেবড়ো। সেই জমিতে কয়েকটা বাঁশ পুঁতে নাইলনের দড়ি টাঙানো। দাড়িতে কয়েকটা জামাকাপড়-শাড়ি শুকোতে দেওয়া রয়েছে। তার পাশে একটা পুরোনো দু-চাকার সাইকেল স্ট্যান্ডে তুলে দাঁড় করানো।

প্রিয়নাথের দৃশ্যগুলো চেনা লাগছিল। কারণ, ডিভিডি-তে চপলকেতুর এপিসোডটা তিনি বেশ কয়েকবার দেখেছেন। দেখেছেন পত্রলোচনকেও।

গাড়ির শব্দ পেয়ে পত্রলোচন বাইরে বেরিয়ে এসেছিলেন। তৃষ্ণা আর বিনোদকুমারকে দেখেই কাঠ-কাঠ হাসলেন। হাসিটা দেখে হালকাভাবে বোঝা গেল যে, টিভির পরদার পাবলিসিটি পত্রলোচনের তেমন পছন্দ নয়।

বিজয় সুমোর ভেতরেই বসে ছিল—নামেনি। প্রিয়নাথদের পাঁচজনকে পত্রলোচন ভদ্রতা দেখিয়ে আপ্যায়নের ভঙ্গিতে বাড়ির ভেতরে আসতে বললেন।

বিনোদকুমার অনেক্ষণ ধরেই ওর ভিডিয়ো ক্যামেরা চালু করে দিয়েছিল। এখন প্রিয়নাথদের দিকে ক্যামেরা তাক করে পত্রলোচনের বাড়িতে ঢোকার দৃশ্যটা ক্যামেরাবন্দি করতে লাগল।

বাইরের ঘরে সবাইকে বসিয়ে পত্রলোচন চা-বিস্কুটের ব্যবস্থা করতে অন্দরমহলের দিকে রওনা হচ্ছিলেন, কিন্তু রমাশঙ্কর দত্ত ওঁকে বাধা দিলেন। বললেন, 'কিছু মনে করবেন না, মিস্টার সিংহরায়...এখন চায়ের ব্যাপারটা থাক। আমরা তো এখানে কয়েকদিন থাকব—ফলে চা খাওয়ার অনেক সুযোগ পাওয়া যাবে। এখন বরং একটু জল খাওয়ান—তারপর কাজের কথা হোক...।'

কথাটা শেষ করেই প্রিয়নাথের দিকে তাকালেন রমাশঙ্কর। ভাবটা এমন যেন ওঁর লড়াইটা শুধু প্রিয়নাথের সঙ্গেই।

মিংকি বা তৃষ্ণা কিছু বলল না। আর বিনোদ দুবার কেশে নিয়ে ওর ক্যামেরা চালু করল।

পত্রলোচন জল আনতে চলে গেলেন। একটু পরেই জল ভরতি চারটে প্লাস্টিকের বোতল নিয়ে ফিরে এলেন।

রমাশঙ্কর বোতল নিয়ে জল খেলেন। 'আঃ—' বলে তৃপ্তির শব্দ করলেন।

বিনোদকুমারও জল খেল। তারপর ক্যামেরা নিয়ে কীসব খুটখাট করতে লাগল।

প্রিয়নাথ ঘরটা দেখছিলেন। মাপে বেশ বড়। সিলিংটাও যথেষ্ট উঁচু তবে দেওয়ালে পলেস্তারা কোথাও আছে, কোথাও নেই। কড়ি-বরগা লোহার হলেও জং ধরে গিয়ে বিপজ্জনক অবস্থায় পৌঁছে গেছে।

ঘরের একদিকের দেওয়ালে ফ্রেমে বাঁধানো গোটা আষ্টেক ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ফটো। ছবিগুলো বিবর্ণ আর ফ্রেম রং চটা, ঘুণ ধরা অস্পষ্ট হলেও এটুকু বোঝা যাচ্ছে ওগুলো মানুষের ছবি। হয়তো পত্রলোচনের পূর্বপুরুষদের।

ঘরে কেমন যেন একটা গন্ধ ঘুরপাক খাচ্ছিল। প্রিয়নাথের মনে হল, গন্ধটা ভেজা মাটি আর শ্যাওলার গন্ধ হলেও হতে পারে। ভেজা মাটি হয়তো কাছাকাছি কোথাও থাকতে পারে—কিন্তু শ্যাওলা এখানে কোথা থেকে আসবে? পুকুর তো অনেক দূরে!

মিংকি নিজের পরিচয় দিয়ে বাকি সকলের সঙ্গে পত্রলোচনের আলাপ করিয়ে দিল। রমাশঙ্কর দত্ত আর প্রিয়নাথ জোয়ারদার কে

ওদের সঙ্গে এসেছেন সেটাও জানাল।

তখন পত্রলোচন প্রিয়নাথ আর রমাশঙ্করের দিকে একে-একে তাকিয়ে গদগদ গলায় বললেন, 'বলুন, স্যার—কী জানতে চান বলুন...।' তিনটে হাতপাখা মেঝেতে পড়ে ছিল। সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে প্রিয়নাথদের দিকে এগিয়ে দিলেন। সঙ্কোচের সঙ্গে বললেন, 'জানেনই তো, এখানে ইলেকট্রিক এখনও আসেনি। তাই পাখা বলতে এগুলো। আপনাদের...বেশ...কষ্ট হবে...।' তারপর পকেট থেকে একটা বিড়ির প্যাকেট বের করে তা থেকে একটা বিড়ি নিয়ে ধরালেন।

প্রিয়নাথ জোয়ারদার ঘামছিলেন। হাত বাড়িয়ে একটা তালপাতার পাখা নিলেন। রমাশঙ্করও একটা নিলেন।

পত্রলোচনের হাতে বিড়ি দেখে প্রিয়নাথের গলা শুকিয়ে উঠল। আর থাকতে পারলেন না। মিংকি আর তৃষ্ণার দিকে তাকিয়ে আবদারের গলায় বললেন, 'উইথ ইয়োর কাইন্ড পারমিশান...।' এবং একটা সিগারেট ধরালেন। ধরানোর পর মনে হল, গরমটা একটু কম লাগছে।

ওঁদের সামনে রাখা একটা জোড়াতালি দেওয়া টেবিলে একটা হাতল ভাঙা কাপ রাখা ছিল। সেটাকেই অ্যাশট্রে হিসেবে পত্রলোচন ব্যবহার করতে লাগলেন। প্রিয়নাথও গৃহকর্তাকে অনুসরণ করলেন।

'এখানে এইসব ভূত-টুতের ব্যাপারগুলো কবে থেকে শুরু হয়?' রমাশঙ্কর বেশ কায়দা করে চিবিয়ে-চিবিয়ে প্রশ্নটা পেশ করলেন। একইসঙ্গে হাতপাখা নেড়ে নিজেকে বাতাস করতে লাগলেন। ওঁর কপালে ঘামের বিন্দু জমছিল।

'সে আর কী অত সাল-তারিখ ধরে মনে আছে! আমি তো সেই জন্ম থেকেই দেখছি...।'

প্রিয়নাথের মনে পড়ল, মিংকিদের প্রোগ্রামেও ভদ্রলোক এই একই প্রশ্নের একই উত্তর দিয়েছেন।

মিংকি আর তৃষ্ণা একটা হাতপাখা শেয়ার করে গরম ম্যানেজ করছিল, আর একমনে পত্রলোচনের কথা শুনছিল।

'সবচেয়ে মেজর ভূতুড়ে ব্যাপারটা ঠিক কীরকম বলতে পারেন?'

পত্রলোচন সিংহ রায় একটা পুরোনো টুলের ওপরে বসেছিলেন। রমাশঙ্করের প্রশ্নে একটু নড়েচড়ে বসলেন। মুখটা দুবার খুললেন, বন্ধ করলেন। তারপর ঃ 'সন্ধের মুখে বা রাতে কখনও-কখনও খুব পায়ের শব্দ শোনা যায়। হাঁটছে...দৌড়চ্ছে...অনেক পায়ের শব্দ। কিন্তু কাউকে দেখা যায় না।'

রমাশঙ্কর তৃষ্ণার দিকে তাকালেন, বললেন, 'ম্যাডাম, প্রোগ্রামে তো ওরকম ছুটন্ত পায়ের শব্দ আপনারাও শুনিয়েছেন। সে-শব্দ কী সত্যিই হয়েছিল, নাকি সাউন্ড এফেক্ট জুড়ে দিয়েছিলেন?'

এই বাঁকা প্রশ্নে তৃষ্ণা, মিংকি, বিনোদকুমার—তিনজনেই একেবারে 'হাঁ-হাঁ' করে উঠল।

প্রিয়নাথ শান্তভাবে বসে সিগারেটে টান দিচ্ছিলেন। রমাশঙ্করের ব্যঙ্গ মেশানো ওস্তাদি ঢংটা ওঁর খুব একটা ভালো লাগছিল না। মনে হচ্ছিল, একু রেস্ট নিতে পারলে ভালো হত।

পত্রলোচন রমাশঙ্করের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে জিগ্যেস করলেন, 'দত্তসাহেব, আপনারা রাতে এখানে থাকবেন তো?'

'হাঁ—অবশ্যই। ব্যাপারটা তলিয়ে দেখতে হবে না? ভূতুড়ে ব্যাপারগুলো কীভাবে কোন কারসাজিতে হচ্ছে সেটার পরদাফাঁস করতে হবে না?' কথাগুলো বলার সময় রমাশঙ্কর বড় বেশি হাত-পা নাড়ছিলেন।

'খুব ভালো, খুব ভালো—' হাতে হাত কচলে বললেন পত্রলোচন, 'নিজের কানেই তা হলে সব শুনতে পাবেন। আর কম-বেশি দেখতেও পাবেন।' তৃষ্ণা আর বিনোদকুমারের দিকে আঙুল দেখালেন ঃ 'ওঁরা তো হঠাৎ করে একবার মাত্র ওই আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলেন...।'

বিনোদকুমার বলল, 'হাঁ—ব্যস একবার। তাও সাউন্ডটা হালকা ছিল।'

তৃষ্ণা তাতে সায় দিল।

প্রিয়নাথের মনে পড়ল, ডিভিডি-তে সেই রেকর্ডিংটা বড় আ[illegible] শোনা গেছে।

বাইরে বেলা পড়ে আসছিল। জোরে বাতাস দিচ্ছিল। সেই বাতা[illegible] খোলা দরজা দিয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ছিল। তার সঙ্গে কেম[illegible] একটা মাটির গন্ধও যেন মিশে ছিল।

সিগারেটে শেষ করে একটা হাই তুললেন প্রিয়নাথ জোয়ারদার। তারপর পত্রলোচনকে জিগ্যেস করলেন, 'রাতে আমরা কোথায় থাক[illegible] লোচনবাবু?'

হাসলেন পত্রলোচন ঃ 'ভালো বলেছেন। লোচনবাবু। আমার নাম[illegible] একেই পিকিউলিয়ার, তার ওপরে বড্ড লম্বা—' একটা পা ভাঁজ ক[illegible] গুটিয়ে বসলেন। হাতের বিড়িটা কাপে গুঁজে দিয়ে মাথা পিছ[illegible] হেলিয়ে দুবার চাড় দিলেন। তারপর ঃ 'আমার মোট-চারটে বা[illegible] আছে। এটাতে আমি ফ্যামিলি নিয়ে থাকি। আর বাকি তিনটে বা[illegible] একটু তফাতে। তার মধ্যে দুটো বাড়ি চানপুকুরের পাড় ঘেঁষে...।'

মিংকির ডিভিডি-তে চানপুকুরের কথা ছিল। বহুকাল আগে থেকে[illegible] ওই পুকুরটা স্নান করার কাজে ব্যবহার হত। সেই থেকেই 'চানপুকু[illegible] নামটা ওই পুকুরের গায়ে লেগে গেছে।

'...তা আপনারা দূরে থাকবেন কেন? ইচ্ছে করলে এ-বাড়িতে[illegible] থাকতে পারেন। দেখছেনই তো, বাড়িটা হাতির মতো বড়। তি[illegible] মহলা বাড়ি। অসংখ্য ঘর। আমি ফ্যামিলি নিয়ে দোতলায় থাকি[illegible] একতলায় পেছনদিকে সার দিয়ে চার-চারটে ঘর আছে। আপনার[illegible] তার যে-কোনওটায় থাকতে পারেন—আমার কোনও প্রবলে[illegible] নেই।'

রমাশঙ্কর বললেন, 'আমার মনে হয় সেটাই ভালো।' প্রিয়নাথে[illegible] দিকে ঘুরে ঃ 'কী বলেন, মিস্টার জোয়ারদার?'

প্রিয়নাথ মনে-মনে ঠিক এই ব্যবস্থাটাই চাইছিলেন। পত্রলোচ[illegible] অন্যরকম কিছু বললে তিনি হয়তো এই প্রস্তাবটাই দিতেন।

আবার হাই তুললেন প্রিয়নাথ। কেন যে এত ঘুম-ঘুম পাচ্ছে [illegible] জানে! হাইয়ের রেশ টেনে বললেন, 'এখানে থাকাটাই ভালো...কাজে[illegible] সুবিধে হবে।'

'তা হলে চলুন, স্যার। আপনাদের ঘরগুলো দেখিয়ে দিই। বাক্স[illegible] প্যাঁটরা নিয়ে আপনারা গুছিয়ে বসুন—।' কথা বলতে-বলতে পত্রলোচ[illegible] উঠে দাঁড়ালেন।

প্রিয়নাথ মানুষটাকে দেখছিলেন।

প্রথমেই যেটা চোখে পড়ে সেটা লোকটার হাইট। এই ধরনে[illegible] মানুষকে বোধহয় তালঢ্যাঙা বলা যায়। মনে পড়ছে, মিংকি পত্রলোচনে[illegible] প্রসঙ্গে একটা অদ্ভুত মন্তব্য করেছিল। বলেছিল, 'লোকটা আননেসেসা[illegible] লম্বা।'

শুধু যে লম্বা তা নয়—বেশ রোগাও। গায়ের রং কালো, তে[illegible] চকচকে। চোখ দুটো বড়-বড়—তার কোণে স্থায়ীভাবে হাসির সূ[illegible] ভাঁজ পড়ে গেছে। চেহারা গ্রাম্য হলেও কোথায় যেন চড়া আত্মবিশ্বাসে[illegible] তেজ লুকিয়ে রয়েছে। ফলে অতি-বিনয়ী ভাবটা পত্রলোচনের মুখো[illegible] হলেও হতে পারে।

প্রিয়নাথ জলের বোতল তুলে নিয়ে আর-একবার জল খেলেন[illegible] মিংকিও ঢকঢক করে খানিকটা জল খেল। তারপর পত্রলোচনকে[illegible] অনুসরণ করে সবাই বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়াল।

পত্রলোচন বললেন, 'গাড়িটা বাড়ির পেছনদিকে ঘুরিয়ে নি[illegible] গেলে আপনাদের মালপত্র নামাতে সুবিধে হবে...।'

সুতরাং প্রিয়নাথ আর রমাশঙ্কর টাটা সুমোয় উঠে পড়লেন। ওদে[illegible] সঙ্গে মিংকিও উঠে পড়ল। আর পত্রলোচন সামনের সিটে ব[illegible] পড়লেন।

বিজয় গাড়ি স্টার্ট দিয়ে বাড়ির পিছনদিকে রওনা হল।

বিনোদকুমার গুনগুন করে গান করছিল। গাড়িটা চলে যেতেই [illegible]

তৃষ্ণার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তৃষ্ণা, আমি সন্ধের পর এখানে থাকব না, আর শুট করতেও পারব না। শুধু দিনের আলোয় যা যা অ্যাক্টিভিটি হবে সেগুলো টোটালি ক্যামেরায় নিয়ে নেব।'

বিনোদের স্বাস্থ্য ভালো। লম্বা-লম্বা চুল। পুরু গোঁফ। এক কানে দুল। সবমিলিয়ে বেশ রাফ অ্যান্ড টাফ চেহারা। কিন্তু বড্ড ভিতু। সেটা আগেরবারই তৃষ্ণা টের পেয়েছিল। সেবারও ওরা সূর্য ডোবার পর চপলকেতুতে থাকেনি। বর্ধমানে হোটেলে চলে গিয়েছিল। নেহাত সন্ধের মুখে ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ শোনা গিয়েছিল, তাই ওটা রেকর্ড করতে পেরেছিল। রাত নেমে গেলে আর সে-সুযোগ হত না।

'বিনোদ, তোমার কাজটাই এবার বেশি। নতুন কোনও ডেটা না পেলে আমার আর নতুন কী বলার আছে—।'

'আচ্ছা, এই প্রিয়নাথ—মানে, গাঞ্জা লোকটা গোস্ট বাস্টিং-এ এফিশিয়েন্ট তো?'

'কে জানে!' ঠোঁট ওলটাল তৃষ্ণা : 'মিংকি তো ওঁর ব্যাপারে খুব কনফিডেন্ট। বলছে যে, প্রিয়নাথ জোয়ারদার ভদ্রলোক নাকি ভূতের গন্ধ পায়।' মাথা ঝাঁকিয়ে তৃষ্ণা বলল, 'ওঃ, মিস্টার জোয়ারদার ভূতের স্মেল পেলে আমাদের চ্যানেলটা উটকো ঝামেলা থেকে বেঁচে যায়...।'

'আমরা তো আগেরবার শুধু দিনেরবেলাতেই শুট করেছিলাম। তাতে শুধু ওই রানিং ফিটের সাউন্ড রেকর্ড করতে পেরেছিলাম। মে বি, রাতে শুট করতে পারলে আরও থ্রিলিং কিছু মেটিরিয়াল পেতাম। শুধু সাউন্ড নয়—ভিশুয়ালসও পেতাম।'

তৃষ্ণা হাসল। ঠাট্টা করে বলল, 'তোমার নার্ভের যা অবস্থা তাতে রাতের থ্রিলিং ভিশুয়াল্‌স পাওয়ার আশা ছাড়ো। কিন্তু ওই দুজনের সাহস আছে বলতে হবে। রাতে এখানেই থাকবে বলছে! দিনেরবেলার চেহারা দেখেই আমার কেমন-কেমন লাগছে তো রাতেরবেলা!'

'তোমার নার্ভও দেখছি আমার চেয়ে কিছু বেটার নয়...।' বিনোদকুমার হাসল। তারপর মোবাইলের ইয়ার প্লাগ কানে গুঁজে দিয়ে গান শুনতে লাগল।

সূর্য হেলে পড়েছে। পশ্চিম দিকটা কমলা রঙে ছেয়ে গেছে। চারপাশে কোনও শব্দ নেই। একজন মানুষও চোখে পড়ছে না। শুধু ছোট-বড় গাছ চুপচাপ দাঁড়িয়ে। তৃষ্ণার মনে হল গাছগুলো ওদের ওপরে নজর রাখছে।

টাটা সুমোটা ফিরে এল।

প্রিয়নাথ, রমাশঙ্কর আর পত্রলোচন গাড়ি থেকে নেমে এলেন। মিংকিও নামল।

তৃষ্ণা আর বিনোদ গাড়িতে উঠতে যাচ্ছিল। আর দেরি করা ঠিক হবে না। একটু পরেই সূর্য ডুবে যাবে। তারপর কী-কী হবে কে জানে!

হঠাৎই তৃষ্ণা খেয়াল করল প্রিয়নাথ মিংকিকে বলছেন, 'না, মিংকি, এটা হয় না। খুব রিস্কি হয়ে যাবে। একটা রাত আমরা দেখে নিই—তারপর যদি সেফ মনে করি তখন দেখা যাবে...।'

'না, ভূতনাথদা—' মাথা ঝাঁকাল মিংকি : 'আপনারা সেফ থাকলে আমিও সেফ থাকব। আমি অ্যাডভেঞ্চারের এতবড় স্কোপটা মিস করতে চাই না। প্লিজ, আপনারা আমাকে তাড়িয়ে দেবেন না। আচ্ছা, আমি প্রমিস করছি, যদি আজ রাতে সেরকম কিছু হয় তা হলে কাল থেকে আমি তৃষ্ণাদের সঙ্গে হোটেলেই থাকব। ও. কে.?'

তৃষ্ণা প্রায় চেঁচিয়ে বলল, 'মিংকি, আর য়ু ক্রেজি?'

হাসল মিংকি। বলল, 'ডোন্ট উয়ারি, তৃষ্ণা। আমি শুধু ফার্স্টহ্যান্ড দেখতে চাই যে, আমাদের চ্যানেল জেনুইন আর অনেস্ট। সো, আমি এখানে থাকছি—ব্যস।'

রমাশঙ্কর হেসে বললেন, 'আপনার কোনও ভয় নেই, মিস তেওয়ারি—এখানে সুপারন্যাচারাল বলে কিছু নেই। কারণ, সুপারন্যাচারাল বলে কিছু হয় না। ওগুলো মানুষের কল্পনা...।'

রমাশঙ্করের কথা শেষ হওয়ার আগেই শব্দটা শোনা গেল।

অনেকগুলো পা একসঙ্গে দৌড়চ্ছে। পত্রলোচনের বাড়িটাকে ঘিরে দৌড়চ্ছে। কখনও বাড়ির ভেতরদিকে চলে যাচ্ছে, কখনও বাড়ির দিক থেকে বেরিয়ে ছুটে যাচ্ছে দূরের গাছপালা আর আগাছা ভরা পতিত জমির দিকে।

বিনোদকুমার আর তৃষ্ণা চট করে গাড়িতে উঠে পড়ল। দড়াম করে দরজা বন্ধ করল।

বিনোদের কানে ইয়ারপ্লাগ গোঁজা ছিল। তাই শব্দ-টব্দ যে ও খুব একটা শুনতে পেয়েছিল তা নয়। কিন্তু এই অলৌকিক ছোটাছুটির সঙ্গে তাল মিলিয়ে মাটিতে কাঁপন জাগছিল। সেটা বিনোদ স্পষ্ট টের পেয়েছিল।

বিজয় রাধে মিংকির দিকে উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে গাড়ি ছেড়ে দেওয়ার অনুমতির জন্য অপেক্ষা করছিল।

মিংকি ওকে ইশারায় চলে যেতে বলল। বিজয় এমনভাবে গাড়িটা ছোটাল যেন ও ফরমুলা ওয়ান-এ নাম দিয়েছে।

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে মিংকি বিজয়কে ওর মোবাইলে ফোন করল।

বিজয় ফোন ধরতেই বলল, কাল সকাল সাড়ে ন'টায় ও যেন বিনোদকুমার আর তৃষ্ণাকে নিয়ে পত্রলোচনবাবুর এখানে চলে আসে।

বাতাসের ঝাপটা শুরু হয়ে গেল হঠাৎ। বিনা মেঘে যেন ঝড় উঠল। গাছপালার পাতায়-পাতায় খসখস শব্দ শুরু হল। মাটিতে পড়ে থাকা শুকনো পাতা আর খড়কুটো ঘূর্ণি বাতাসে ঘুরপাক খেতে লাগল। প্রিয়নাথদের চোখে-মুখে এসে আছড়ে পড়তে লাগল।

প্রিয়নাথ ঘটনাটা শুধু দেখছিলেন এবং শুনছিলেন না—অনুভব করতেও চাইছিলেন। মিংকির ভিডিডি-তে ঝড় ওঠেনি, মাটি কাঁপার কথাও বলা হয়নি।

সন্ধে হয়ে আসছে। আকাশে মলিন কমলা আর লাল রং। তারই মাঝে-মাঝে গাঢ় ছাই রঙের মেঘের তুলির রেখা। বাসায় ফেরা কোনও পাখির দেখা নেই আকাশে।

প্রিয়নাথের পায়ের নীচে জমি কাঁপছিল। আর অসংখ্য অদৃশ্য পায়ের ছোটাছুটি চলছিল।

মিংকি চোখ বড়-বড় করে জিগ্যেস করল, 'প্রিয়নাথদা, কী ব্যাপার?'

প্রিয়নাথ ঠোঁটে আঙুল রেখে ইশারায় ওকে চুপ করে থাকতে বললেন।

কিন্তু রমাশঙ্কর দত্ত হেসে উঠলেন। হাসিটা কাঠ-কাঠ এবং বোকার মতো শোনাল। তারপর যে-কথাটা বললেন সেটা বোকা-বোকা শোনাবে জেনেও বলে ফেললেন, 'ভূমিকম্প হচ্ছে—ভূমিকম্প। হালকা। সাইজমোগ্রাফ থাকলে বোঝা যেত...।'

মিংকি অবাক হয়ে বলল, 'ভূমিকম্প! শুধু এই জায়গাটায়?'

'হয়তো অন্য জায়গাতেও হচ্ছে—আমরা সেটা জানব কী করে! জানেন, বছরে মোট দশ লাখেরও বেশি আর্থকোয়েক হয়?'

পত্রলোচন চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলেন। এবার প্রায় ফিসফিস করে বললেন, 'এখানে তো আকছারই এরকম ভূমিকম্প হচ্ছে।' কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর : 'চলুন, স্যার, ভেতরে চলুন। আঁধার হয়ে আসছে—বাইরে থাকার আর দরকার নেই।'

পত্রলোচনের সঙ্গে ওরা তিনজন বাড়ির ভেতরে ঢুকে এলেন। তখনও ছোটাছুটির শব্দটা আবছাভাবে শোনা যাচ্ছিল।

মিংকি পত্রলোচনকে জিগ্যেস করল, 'এসব যে উলটোপালটা ব্যাপার হয় তাতে এখানে থাকতে আপনার ভয় করে না?'

মলিন হাসলেন পত্রলোচন : 'ওসব গা সওয়া হয়ে গেছে, দিদিভাই—।'

ঘরে টেবিলের ওপরে দুটো হ্যারিকেন জ্বলছিল। নিশ্চয়ই ওঁর স্ত্রী কিংবা ছেলে এক ফাঁকে জ্বেলে দিয়ে গেছে।

এখনও পর্যন্ত ওদের দেখা পাননি এ-কথা ভেবে প্রিয়নাথের একটু অবাক লাগছিল।

৫

বাড়ির পিছনদিকে তিনটে ঘরে প্রিয়নাথরা আস্তানা গেড়েছেন। পাশাপাশি দুটো ঘরে মিংকি আর প্রিয়নাথ। তারপর একটা ঘর বাদ দিয়ে রমাশঙ্কর।

আজ রাতের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা পত্রলোচন নিজের ভাঁড়ার থেকেই করেছেন। মিংকি চ্যানেলের তরফ থেকে খরচ বাবদ ওঁকে দু-হাজার টাকা দিয়েছে। পত্রলোচন কিছুতেই টাকা নিতে চাননি। বলেছেন, ওঁর শরীরে বারো ভূঁইঞার রক্ত। কী করে তিনি টাকা নেবেন!

অনেক জেদাজেদি করে তারপর মিংকি ওঁকে টাকা দিতে পেরেছে।

তিনজনের ঘরেই দুটো করে হ্যারিকেন আর মোমবাতি দিয়ে গেছেন পত্রলোচন। তার সঙ্গে একটা করে হাতপাখা। ইলেকট্রিসিটি নেই বলে বারবার দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তাতে প্রিয়নাথরা বলেছেন যে, চপলকেতুর এপিসোডটা দেখে ওঁরা আগে থেকেই এ-খবরটা জানতেন। সুতরাং ওঁর অস্বস্তির কোনও কারণ নেই।

প্রিয়নাথ ওঁর ঘরে মেঝেতে বসে ছিলেন। গায়ে হাতকাটা রঙিন পাঞ্জাবি আর সাদা পাজামা। সামনে একটা সুটকেস। তার ডালাটা খোলা। হ্যারিকেনের আলোয় সুটকেসের ভেতরের জিনিসগুলো দেখা যাচ্ছিল। ভূতশিকারির 'অস্ত্রশস্ত্র'।

ঘরের দেওয়ালে একটা ছায়া দেখতে পেয়ে চমকে মুখ ফেরালেন ভূতনাথ।

মিংকি এসে ঘরে ঢুকেছে। ওর পরনে জিন্স আর টি-শার্ট। হাতে একটা টর্চ। হ্যারিকেনের আলোয় দেওয়ালে ওর বেঢপ ছায়া পড়ছে।

'কী? একা-একা ভয় করছে নাকি?' প্রিয়নাথ মজার সুরে জিগ্যেস করলেন।

'জানেন, আমার মোবাইলে কোনও টাওয়ার পাচ্ছি না! অথচ বিকেলবেলায় ছিল! বাড়িতে একটা ফোন লাগাতে গিয়ে দেখি টাওয়ার গন...।'

'আমারও একই অবস্থা।...আরও দু-একদিন না দেখে ঠিক বোঝা যাবে না এর রিজ্‌নটা সাইবারস্পেসের সমস্যা, না চপলকেতুর সমস্যা...।'

মিংকি কিছুক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে রইল ভূতনাথের দিকে। ওর মুখে দিশেহারা ভাব।

তারপর সটান এসে বসে পড়ল প্রিয়নাথের পাশে। বলল, 'সত্যি, আপনি আছেন বলে ভয় করছে না—নইলে করত। এসব কী?' খোলা সুটকেসের দিকে আঙুল দেখিয়ে জিগ্যেস করল।

'এগুলো ভূত খোঁজার কাজে লাগে...।'

মিংকি সুটকেসের সরঞ্জামগুলো দেখছিল। প্যাড, পেনসিল, একটা ছোট টেপরেকর্ডার, চার ব্যাটারির তেজি টর্চ, আর একটা ছোট টর্চ, ভিডিয়ো ক্যামেরা, ডিজিটাল ক্যামেরা, নানান মাপের অনেকগুলো ব্যাটারি, পোস্ট-ইট নোটের ছোট প্যাড, দরজিরা যে ব্যবহার করে সেরকম রঙিন মার্কার, নরম মোম, টেপ-মেজার, সুতোর গুলি, কাঁচি, হাফডজন মোমবাতি, থার্মোমিটার আর ম্যাগনেটিক কম্পাস।

এগুলোর ব্যবহার সম্পর্কে মিংকি কিছু-কিছু খবর জানে। কারণ, ওদের চ্যানেলে ইন্টারভিউ দেওয়ার সময় ভূতনাথ ভূতশিকারির কাজকর্ম সম্পর্কে বেশ কিছু কথা ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন।

যেমন, ভূতদের চরিত্র সম্পর্কে বলেছিলেন, '...ভূত-প্রেতরা হচ্ছে অনেকটা আমাদের পুলিশের মতো। দরকারের সময় দেখা দেয় না। মানে, যখন তুমি সাংঘাতিকভাবে কোমর বেঁধে ভূতের খোঁজ করছ, তখন তার দেখা পাবে না। আর যখন তুমি ভূতের দেখা পাওয়া যাবে বলে ভাবছই না, তখন তারা হঠাৎ করে হাজির হয়ে তোমাকে একেবারে চমকে দেবে। তাই সবসময় তৈরি থাকতে হয়...।'

'ভূতনাথদা, ছোটাছুটির আওয়াজগুলো কীসের? কিছু আইডিয়া করতে পারলেন?' মিংকি চাপা গলায় জানতে চাইল।

'না, এখনও বুঝতে পারিনি। ব্যাপারটা কি জেনুইন, নাকি পত্রলোচনের লোকঠকানো ম্যাজিক—সেটা নিয়েও ভাবছি। তা ছাড়া আমাদের ডেকে নিয়ে এসে এরকম ভূতুড়ে ম্যাজিক দেখিয়ে ওঁর কী লাভ?'

কিছুক্ষণ চুপ করে ভাবলেন ভূতনাথ। তারপর মিংকিকে জিগ্যেস করলেন, 'আচ্ছা, তোমরা কী করে এই ভূতুড়ে স্পটটার খোঁজ পেলে বলো তো? পত্রলোচন সিংহ রায় কি নিজে তোমাদের চ্যানেলের সঙ্গে কনট্যাক্ট করেছিলেন?'

'না, না—' মাথা নাড়ল মিংকি ঃ 'উনি কোনও কনট্যাক্ট করেননি। আমরাই এই হন্টেড স্পটটার খোঁজ পেয়েছিলাম। আমাদের চ্যানেলের স্ক্রিপ্ট সুপারভাইজার অলোকদা—অলোক সান্যাল—উনিই আমাকে জায়গাটার খোঁজ দিয়েছিলেন। ওঁর কোন এক রিলেটিভ নাকি শিবাইচণ্ডীর কাছাকাছি কোথায় থাকেন। তাঁর কাছ থেকে অলকদা এখানকার হন্টিং-এর খবরটা পান...।'

ঠোঁট কামড়ালেন প্রিয়নাথ ঃ 'তা হলে তো পত্রলোচনকে সন্দেহ করা যাবে না। তা ছাড়া এসব ম্যাজিক-ফ্যাজিক দেখিয়ে ওঁরই বা কী বেনিফিট? তোমরা কি ওঁকে কোনও টাকাপয়সা দিয়েছ নাকি?'

'এক পয়সাও দিইনি।' জোর গলায় বলল মিংকি, 'প্রথমে তো ভদ্রলোক শুট করার ব্যাপারে বেশ ভালোরকম আপত্তি করেছিলেন। অনেক তোয়াজ করে ওঁকে রাজি করানো হয়েছে। পরে তৃষ্ণা আর বিনোদের সঙ্গে ওঁর খুব হার্টি রিলেশান হয়ে যায়। ওভারঅল মানুষটা খারাপ না। শুট করার পর বিনোদরা টাকা অফার করেছিল কিন্তু উনি নেননি। দেখলেন না, আমি যে দু-হাজার টাকা এক্সপেন্সের জন্যে দিচ্ছিলাম সেটাও প্রথমে নিচ্ছিলেন না—।'

'হুঁ—।' আনমনাভাবে বললেন প্রিয়নাথ।

টর্চ আর ডিজিটাল ক্যামেরা হাতে নিলেন। তারপর উঠে দাঁড়ালেন।

'চলো, একটু বাইরে যাই—।'

প্রিয়নাথ আর মিংকি বাইরের দিকে পা বাড়াল।

মিংকি বলল, 'মিস্টার দত্ত একবার আমার রুমে এসেছিলেন। ওই দৌড়োদৌড়ির শব্দটাকে আর্থকোয়েকের ট্রেমরের শব্দ বলে আর-একবার বুঝিয়ে গেলেন। ভদ্রলোক বলে কী, সবকিছুরই একটা সায়েন্টিফিক এক্সপ্ল্যানেশান আছে। যখন আমরা সেই এক্সপ্ল্যানেশনটা খুঁজে পাই না, তখন সেই ঘটনার গায়ে "ভৌতিক" লেবেল সেঁটে দিই...।'

প্রিয়নাথ ছোট্ট করে হাসলেন। পকেট থেকে সিগারেট আর লাইটার বের করে ধরালেন।

কথা বলতে-বলতে ওরা বাইরে এসে দাঁড়াল।

ওদের চোখের সামনে ঘোলাটে অন্ধকার। পিছনে বাড়িটা একটুকরো পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে।

সিগারেটের আগুনের আভায় প্রিয়নাথের আবছা প্রোফাইল দেখা যাচ্ছিল।

মিংকি জিগ্যেস করল, 'মিস্টার সিন্‌হা রয়ের ওয়াইফ আর সানের ব্যাপারটা কিন্তু বেশ মিস্টিরিয়াস। আমরা সেই বিকেল তিনটেয় এসেছি, কিন্তু এখনও পর্যন্ত তাদের একবারও দেখলাম না...।'

'হয়তো ওরা অসুস্থ...বেডরিড্‌ন...কে জানে!' সিগারেটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লেন প্রিয়নাথ।

'না, ভূতনাথদা—শুধু এবারে নয়, লাস্ট টাইম বিনোদ, তৃষ্ণা, আরও সবাই...ওরা যখন তিনদিন ধরে কাজ করেছিল তখনও পত্রলোচনের ওয়াইফ আর সানকে দেখতে পায়নি!'

'ঠিক আছে—কাল সকালে ওঁকে জিগ্যেস করে দেখব...।'

সময়টা বর্ষা থেকে শরতের দিকে ঢুকে পড়ছে। তাই গরম সেরকম নেই। আর হাওয়া বইছে এলোমেলোভাবে। ভেজা মাটির গন্ধ আর কিছুটা গাছ-পাতা কিংবা শ্যাওলার গন্ধ প্রিয়নাথের নাকে আসছিল।



সিগারেটে আমেজের টান দিতে দিতে কী মনে হওয়ায় পকেট থেকে টর্চটা বের করে নিলেন। সামনের গাছপালা আর মাঠের দিকে তাক করে টর্চ জ্বাললেন। যতটুকু দেখা গেল সবটাই নিরীহ দৃশ্য : গাছের গুঁড়ি, ফাঁকা মাঠ, আর অন্ধকার।

মাটির দিকে টর্চের আলো ফেললেন প্রিয়নাথ। সাধারণ ঘাস মাটির জমি। সেখানে কোনও ফাটল চোখে পড়ল না।

কয়েকটা পাখি-টাখি উড়ে যাওয়ার ডানা ঝাপটানোর শব্দ পেলেন। কিন্তু ওপরে চোখ তুলে কোনও উড়ন্ত ছায়া দেখতে পেলেন না। শুধু আকাশের মলিন চাঁদের সঙ্গে চোখাচোখি হল।

এইরকম অজ গাঁয়ে রাতে ঝিঁঝির ডাক শুনতে পাওয়াটা বলতে গেলে স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু প্রিয়নাথ খেয়াল করলেন, ঝিঁঝির ডাক এক কণাও শোনা যাচ্ছে না।

চারপাশটা এত নিস্তব্ধ, এত ফাঁকা যে, প্রিয়নাথের কেমন একা-একা লাগছিল।

হঠাৎই পিছনে পায়ের শব্দ পেয়ে তাকালেন।

রমাশঙ্কর দত্ত। টর্চ জ্বেলে প্রিয়নাথদের দিকেই আসছেন।

'কী, মিস্টার জোয়ারদার, আর কিছু পেলেন?'

প্রিয়নাথ মাথা নাড়লেন, তারপর বললেন, 'না—।'

'ওই যে সন্ধের মুখে শব্দটা আমরা শুনলাম, সেটা আর্থকোয়েকের ট্রেমর। ন্যাচারাল ফেনোমেনন—সুপারন্যাচারাল কিছু নয়। একটু আগে মিস তেওয়ারিকে আমি বলছিলাম...।'

কথা বলতে-বলতে প্রিয়নাথদের কাছে এসে দাঁড়ালেন।

ঠিক তখনই দূরে কী একটা যেন প্রিয়নাথের নজরে পড়ল। তিনি গভীর মনোযোগে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন। রমাশঙ্করের কথার কোনও জবাব দিলেন না।

প্রিয়নাথকে চুপ করে থাকতে দেখে মিংকি ওঁর দিকে তাকাল। তারপর ওঁর নজর অনুসরণ করে দূরে।

বহুদূরে একটা সাদা মেঘের পিণ্ড চোখে পড়ছে। মাটির খুব কাছাকাছি। মাটি থেকে বড়জোর পাঁচ-ছ'হাত ওপরে। খুব ধীরে ধীরে ভেসে আসছে প্রিয়নাথদের দিকে। আর যত কাছে আসছে তত মাপে বাড়ছে, ছড়িয়ে পড়ছে।

'ভূতনাথদা, ওটা কী?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না। মেঘ বা কুয়াশার মতো মনে হচ্ছে...।'

'এরকম সময়ে ফগ তো ইমপসিব্‌ল! আর মেঘ এত নীচে নেমে আসবে কেমন করে?' মিংকি অবাক হয়ে বলল।

রমাশঙ্কর গলাখাঁকারি দিয়ে বললেন, 'ওটা মেঘ নয়, কুয়াশাও নয়। ওটা হল ধোঁয়া। লোকাল লোকজন উনুন ধরিয়েছে...।'

প্রিয়নাথ রমাশঙ্করের দিকে ঘুরে তাকালেন। সত্যি, চটজলদি ব্যাখ্যার জোগান দিতে রমাশঙ্করের জবাব নেই। সিগারেটে শেষ টান দিয়ে টুকরোটা ছুড়ে ফেলে দিলেন। তারপর : 'এখানে লোকাল লোক কোথায়?'

'হয়তো আছে—আমাদের চোখে পড়েনি...।'

কুয়াশার পিণ্ডটা ক্রমশ এগিয়ে আসছিল, আর মাপে বাড়তে-বাড়তে অনেকটা এলাকায় ছেয়ে গেল।

হঠাৎই বাতাসের উষ্ণতা কমতে লাগল। ওরা তিনজনই সেটা টের পেল।

প্রিয়নাথ বললেন, 'আমি একটু আসছি—।' বলে তাড়াতাড়ি ঘরের দিকে হাঁটা দিলেন।

মিংকি একটু ভয়ের গলায় রমাশঙ্করকে জিগ্যেস করল, 'এখনও কি বলবেন, লোকাল লোকজন উনুন ধরিয়েছে?'

রমাশঙ্কর বুঝতে পারছিলেন যে, ওঁর যুক্তি তেমন একটা টেকসই জমি পাচ্ছে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও নিজের জেদ আঁকড়ে রইলেন।

'হ্যাঁ, তাই বলব—অন্তত যতক্ষণ না আপনাদের কথার কংক্রিট প্রুফ পাচ্ছি। কাল দিনেরবেলা ওখানে গিয়ে জায়গাটা ইনস্পেক্ট করলেই সব বোঝা যাবে...।'

প্রিয়নাথ ফিরে এসেছিলেন। বাঁ-হাতে টর্চ জ্বেলে ডানহাতের একটা জিনিসের ওপরে ধরলেন।

মিংকিরা জিনিসটা দেখতে পেল : একটা লম্বা থার্মোমিটার—খুব চেনা ডাক্তারি থার্মোমিটারের মতো নয়।

মনোযোগ দিয়ে থার্মোমিটারের রিডিং দেখছিলেন প্রিয়নাথ। লক্ষ করলেন, ধীরে-ধীরে উষ্ণতা কমছে।

চোখ তুলে কুয়াশার দিকে তাকালেন। ওটা আরও কাছে এগিয়ে এসেছে, মাপে আরও বড় হয়েছে।

রমাশঙ্কর ঝুঁকে পড়ে থার্মোমিটারের ওপরে নজর রেখেছিলেন। বিরক্তির একটা ছোট্ট শব্দ করে বললেন, 'আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনার কোনও জবাব নেই। যখন-তখন ইর‍্যাটিক্যালি বিহেভ করে। যেখানে আবহাওয়া দপ্তর এসব ব্যাপার কিছুতেই এক্সপ্লেইন করতে পারে না, সেখানে আমরা কীভাবে এক্সপ্লেইন করব!'

এ-কথার কেউ কোনও জবাব দিল না।

প্রিয়নাথ থার্মোমিটার এক পকেটে রেখে অন্য পকেট থেকে একটা চৌম্বক কম্পাস বের করলেন। কম্পাসের ডায়ালে টর্চের আলো ফেললেন।

কম্পাসের কাঁটা এখন উত্তরদিকে মুখ করে নেই। খানিকটা পুবদিকে সরে গিয়ে এলোমেলোভাবে কাঁপছে, পাগলা ঘোড়ার মতো ছটফট করছে।

মিংকির হঠাৎই ভয়-ভয় করতে লাগল। আর্থের ম্যাগনেটিক ফিল্ডের এরকম অস্থির দশা কেন? আর টেম্পারেচার কমে যাওয়ারই বা মানে কী?

রমাশঙ্কর দত্ত প্রিয়নাথের কম্পাস ধরা হাতের ওপরে ঝুঁকে পড়েছিলেন। ভদ্রলোক অদ্ভুত ধরনের ছিনে জোঁকের মতো প্রিয়নাথের সঙ্গে সেঁটে রয়েছেন। যখনই প্রিয়নাথ আপাতভাবে অলৌকিক কোনও ব্যাপারস্যাপারের মুখোমুখি হচ্ছেন তক্ষুনি রমাশঙ্কর তার একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার জোগান দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন।

কম্পাসের কাঁটার গতিপ্রকৃতি কিছুক্ষণ ধরে লক্ষ করার পর রমাশঙ্কর বললেন, 'পৃথিবীর চৌম্বক ধর্মের ব্যাপারটা বেশ রহস্যময়। পৃথিবী যে কেন একটা চুম্বক তার সঠিক কারণ বিজ্ঞানীরা এখনও জানে না—শুধু হাতড়ে বেড়াচ্ছে। একটা ডাইপোল থিয়োরি আছে বটে, তবে সেটা অনেকটা কানা মামার মতো। আসলে আর্থের ম্যাগনেটিক ফিল্ড হল একটা দুরন্ত বাচ্চা—কখন কীভাবে বিহেভ করবে তার কোনও ঠিকঠিকানা নেই। সেইজন্যেই কম্পাসের কাঁটাটা এরকম পাগলামো করছে, বুঝলেন?'

প্রিয়নাথ বেশ অবাক হয়ে রমাশঙ্করের মুখের দিকে তাকালেন। কিছু বললেন না। বোধহয় বলার মতো কিছু খুঁজে পেলেন না।

কুয়াশার পিণ্ডটা আরও এগিয়ে আসছিল। তার সঙ্গে টেম্পারেচার কমে যাওয়ার ব্যাপারটা বেশ স্পষ্টভাবে অনুভব করা যাচ্ছিল।

প্রিয়নাথ লক্ষ করলেন, মিংকি কেমন ভয়ে সিঁটিয়ে গেছে। তাই কম্পাস পকেটে রেখে বললেন, 'চলুন, আমরা লোচনবাবুর ঘরে যাই। সেখানে গিয়ে একসঙ্গে বসে একটু গল্পগুজব করি...। তা হলে মনটা হালকা হবে। এখানে চারপাশে এত অন্ধকার...!'

প্রস্তাবটা রমাশঙ্কর এবং মিংকি দুজনেই একেবারে লুফে নিল।

সুতরাং, ওঁরা তিনজনে বেশ চটপটে পায়ে বাড়ির সামনের দিকে এগোতে শুরু করলেন। সবার আগে রমাশঙ্কর—ওঁর হাতে টর্চ জ্বলছে। তার ঠিক পিছনেই প্রিয়নাথ আর মিংকি। মিংকির হাতে একটা ছোট টর্চ ছিল, কিন্তু প্রিয়নাথ টর্চ জ্বেলেছেন বলে ও সেটা আর জ্বালেনি।

রমাশঙ্কর যে হাঁটতে-হাঁটতে দুবার ভেসে আসা কুয়াশার দিকে ঘ ঘুরিয়ে তাকিয়েছেন সেটা প্রিয়নাথের নজর এড়ায়নি। মিংকি প্রোগ্রামে এই কুয়াশার ছবি না দেখানো হলেও পত্রলোচন ইন্টারভিউতে এটার কথা সংক্ষেপে বলেছেন।

প্রিয়নাথ ভাবছিলেন, পত্রলোচন ওঁর ইন্টারভিউতে এমনভ কথাবার্তা বলেছেন যে, 'সেসব কথা শোনার পর কোনও দ চপলকেতুতে আসতে ভয় পাবে।

ব্যাপারটা প্রিয়নাথের একটু অদ্ভুত লেগেছিল। পত্রলোচনের জায় যদি তিনি থাকতেন, তা হলে তিনি চাইতেন টিভিতে সবকিছু দে পর চপলকেতু গ্রামে মানুষজন আসুক, জায়গাটা জমজমাট হে তার ভূতুড়ে অভিশাপটা কেটে যাক। কারণ, তা হলে এই অভি এলাকায় চাষবাস হত, দোকানপাট তৈরি হত, জমির দাম বাড়ত তাতে পত্রলোচন সিংহ রায়ের খারাপ না হয়ে বরং ভালোই হ

ওঁরা সদর দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। আবহাওয়াতে আশ্চর্যভ হেমন্তের আমেজ তৈরি হয়ে গিয়েছিল। শীত-শীত বাতাসে গায়ে ক দিচ্ছিল।

রমাশঙ্কর চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলেন, 'লোচনবাবু! লোচনবাবু

ওঁর ডাক শুনে স্পষ্ট মনে হচ্ছিল, কারও তাড়া খেয়ে নিরা আশ্রয়ের খোঁজে উতলা হয়ে গেছেন।

মিংকি তাড়াহুড়ো করে একছুটে তিন ধাপ সিঁড়ি উঠে ভেজ দরজায় ধাক্কা দিল।

দরজা সটান খুলে যেতেই ঘরের ভেতরের দৃশ্যটা প্রিয়নাথ দেখ পেলেন।

মিংকিও যে দৃশ্যটা দেখেছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই—কা ও ছিল সবার আগে। বরং রমাশঙ্কর হয়তো দেখতে পাননি—কা তিনি তখন সিঁড়ির ধাপ বেয়ে ওঠার কাজে মাথা ঝুঁকিয়ে ব্যস্ত ছিলে

দৃশ্যটা প্রিয়নাথের ভারী অদ্ভুত লাগল।

ঘরের প্রায় মাঝখানে দাঁড়িয়ে পত্রলোচন একজন ভদ্রমহিলা ও একজন যুবকের সঙ্গে কথা বলছিলেন। দরজা খোলার শব্দ পে ভদ্রমহিলা এবং ছেলেটি শশব্যস্তভাবে চট করে অন্য একটা দ দিয়ে বাড়ির অন্দরে চলে গেল।

ঘরের ভেতরে বিকেলে দেখা টেবিলটার ওপরে একটা মোটাসে মোমবাতি জ্বলছে। মোমের আলোয় 'আননেসেসারি লম্বা' পত্রলে সিংহ রায়ের আরও লম্বা ছায়া দেওয়ালে পড়েছে।

পত্রলোচন যাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন তাদের দুজনের চো কালো রঙের সানগ্লাস—সাধারণত ছানি অপারেশানের পর যের চশমা লোকে পরে থাকে।

এক ঝলক দেখে মহিলার যা বয়েস আন্দাজ করা গেল তাতে ছ অপারেশান করানোটা তার পক্ষে অস্বাভাবিক নয়।

কিন্তু ছেলেটির বয়েস বড়জোর সাতাশ কি আটাশ। তার পক্ষে ছ অপারেশানের ব্যাপারটা রীতিমতো অস্বাভাবিক।

এরা দুজনই যদি পত্রলোচন সিংহ রায়ের স্ত্রী এবং ছেলে হয় হলে একইসঙ্গে মা ও ছেলের ছানি অপারেশানের ব্যাপারটা শুধু অস্বাভাবিক তা নয়, বরং বেশ অদ্ভুত।

মিংকি রমাশঙ্করকে ডিঙিয়ে প্রিয়নাথের দিকে তাকাল। ওর চে অবাক ভাবটা লুকোনো নেই।

রমাশঙ্কর আর প্রিয়নাথ ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়েছিলেন। প্রিয় দরজাটা তাড়াতাড়ি ভেজিয়ে দিলেন।

পত্রলোচন ওঁদের ভাবভঙ্গি দেখে কিছু একটা আন্দাজ ক বললেন, 'হিমকুয়াশা। প্রকৃতির পাগলামো। একটু পরে নিজে থেকে কেটে যাবে।'

মিংকি অন্দরে যাওয়ার খোলা দরজাটার দিকে তাকিয়ে ছিল। সে লক্ষ করে পত্রলোচন বললেন, 'আমার ওয়াইফ আর ছেলের স কথা বলছিলাম। ওরা ভীষণ মুখচোরা—অচেনা লোকজনের সাম

বেরোতে চায় না, কারও সঙ্গে কথা বলতে চায় না...।' তারপর ওঁর খেয়াল হল, প্রিয়নাথরা তখন থেকে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাই সাততাড়াতাড়ি বললেন, 'আরে, আপনারা দাঁড়িয়ে কেন, বসুন...।'

প্রিয়নাথ আর রমাশঙ্কর দুটো প্লাস্টিকের চেয়ারে বসলেন।

মিংকি বসল না। বরং হঠাৎই পত্রলোচনকে জিগ্যেস করল, 'আচ্ছা, মিস্টার সিন্হা রয়, কিছু মনে করবেন না...মানে...।'

'কী, বলুন—।'

'আপনার ওয়াইফ আর ছেলের চোখে ডার্ক গ্লাসেস দেখলাম মনে হল...।'

'আপনি ঠিকই দেখেছেন, মিস তেওয়ারি...।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন পত্রলোচন।

'ওঁদের কি ছানি অপারেশান হয়েছে?' আর দেরি না করে ভূতনাথ সরাসরি প্রশ্নটা করলেন।

'না—ক্যাটারাক্ট অপারেশান হয়নি। ওদের দুজনেরই চোখে একটা পিকিউলিয়ার অসুখ হয়েছে। একটুও আলো সহ্য করতে পারে না। তাই সবসময় সানগ্লাস পরে থাকে...।'

'কী অসুখ? গ্লকোমা?' এবার রমাশঙ্কর জিগ্যেস করলেন।

'ওই টাইপেরই কী একটা রেয়ার অসুখ। নামটা খুব খটমট। ট্রিটমেন্ট চলছে...অল্প-অল্প ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে। দেখা যাক, শেষ পর্যন্ত পুরোটা সারে কি না...।'

কথা বলতে-বলতে পত্রলোচন প্রিয়নাথদের মুখোমুখি এসে বসলেন। মোমবাতির আলোয় একটা দেওয়ালে প্রিয়নাথের ছায়া পড়েছে। পত্রলোচন আর রমাশঙ্করের ছায়া পড়েছে অন্য দুটো দেওয়ালে।

ঘরের ঠান্ডা ভাবটা ক্রমশ কমে আসছিল। হয়তো বাইরের সেই অদ্ভুত কুয়াশা এখন ফিকে হয়ে গেছে।

মিংকিকে দেখে প্রিয়নাথের মনে হল, ওর একটু আগের ভয়-ভয় ভাবটা কেটে গেছে। ও দেওয়ালের পুরোনো ফটোগুলোর ওপরে টর্চের আলো ফেলে ওগুলো খুঁটিয়ে দেখার চেষ্টা করছিল।

প্রিয়নাথ হাতঘড়ির দিকে তাকালেন। রাত সওয়া ন'টা।

তাই দেখে পত্রলোচন জিগ্যেস করলেন, 'রাতের খাওয়া কি এখন সেরে নেবেন? বলেন তো আপনাদের ঘরে খাবার পৌঁছে দিয়ে আসি...।'

প্রিয়নাথ হেসে বললেন, 'আপনার এখানে এসে থেকে এমন সব ঘটনার সাক্ষী থাকছি যে, খাওয়াদাওয়ার চিন্তা মাথা থেকে উবে গেছে। এখন তো সবে সওয়া ন'টা বাজে—বরং দশটা নাগাদ খাওয়ার কথা ভাবা যাবে। তাতে আপনার কোনও প্রবলেম হবে না তো?'

'না, না, আমার আর প্রবলেম কীসের!'

প্রিয়নাথ একটা সিগারেট ধরালেন। মিংকির দিকে একবার তাকালেন। এখনও ও ফটোগুলোর সামনে ঘোরাঘুরি করছে।

প্রিয়নাথের মুখ থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছিল। সেই ধোঁয়া দেওয়ালে অদ্ভুত ছায়া তৈরি করছিল।

রমাশঙ্কর পত্রলোচনকে জিগ্যেস করলেন, 'একটু আগে যে কুয়াশার ব্যাপারটা অবজার্ভ করলাম সেটা কি প্রায়ই হয়?'

কাশলেন পত্রলোচন। পকেট থেকে বিড়ি বের করে একটা ধরিয়ে ফেললেন। পরপর দুটো টান দেওয়ার পর বললেন, 'বহুদিন ধরে এমনটা হয়। প্রায়ই হয়। তবে কোনও নিয়ম-টিয়ম মেনে হয় না—।'

'বাঃ, তবে তো একরকম ন্যাচারাল ফেনোমেনন বলা যায়...।'

প্রিয়নাথ তেরছা চোখে রমাশঙ্করের মুখের দিকে একবার তাকালেন শুধু, কিছু বললেন না।

পত্রলোচন স্মৃতিচারণ করার সুরে বললেন, 'রাতেরবেলাতেই তো উলটোপালটা কাণ্ডকারখানাগুলোর বাড়বাড়ন্ত হয়। দিনে আর কতটুকু! ওই কুয়াশার ব্যাপারটা লোক-জানাজানি হওয়ার পর থেকেই সবাই বলতে থাকে, এ-অঞ্চলটায় কুনজর পড়েছে। তারপর একে-একে সব লোকজন ভিটে-মাটি খেত-জমি ছেড়ে চলে যেতে থাকে। তো আপনারা বলবেন আমি একা পরিবার নিয়ে এখানে মাটি আঁকড়ে পড়ে আছি কেন?' বিড়িতে দু-তিনবার ঘন-ঘন টান দিলেন। তারপর : 'আমি তো এখানকার জমিদার! এখানকার রাজা! আমার শরীরে বীর সিং-এর রক্ত! আমি হার মেনে পালাই কেমন করে? রাজা কি কখনও প্রজার মতো আচরণ করতে পারে? কখখনও না!'

পত্রলোচনের গলার স্বর চড়ছিল। বড়-বড় চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছিল।

মিংকি ফটোর দিক থেকে নজর সরিয়ে পত্রলোচনের দিকে ফিরে তাকিয়েছিল।

নিজেকে সামলে নিয়ে তালঢ্যাঙা কালো মানুষটা বলল, 'ক'টা রাত এখানে থেকে দেখে যান। দিনেরবেলা কি অতকিছু দেখা যায়! তখন শোনা যায়, দেখা যায় না...।'

'এখানে আপনার থাকতে কোনও অসুবিধা হয় না?' প্রিয়নাথ জিগ্যেস করলেন।

হাসলেন পত্রলোচন : 'ওই যে বললাম...গা সওয়া হয়ে গেছে...।'

ওঁর কথা শেষ হতে না হতেই পায়ের শব্দ শোনা গেল আবার। বেশ কয়েকজোড়া পা পাগলের মতো ছুটে বেড়াচ্ছে। ধপ-ধপ-ধপ-ধপ। সেই ছুটন্ত পায়ের আঘাতের দাপটে ঘরের মেঝে কাঁপছে।

মিংকি ভয়ের গলায় বলে উঠল, 'ওই...আবার!'

রমাশঙ্কর বললেন, 'আর্থকোয়েক! ভূমিকম্প!'

প্রিয়নাথ তাড়াতাড়ি পাঞ্জাবির পকেট থেকে কম্পাসটা বের করলেন। টর্চের আলো জ্বেলে কম্পাসের কাঁটার গতিপ্রকৃতি তীক্ষ্ণ নজরে দেখতে লাগলেন।

একটু আগে যেমনটা হয়েছিল কাঁটা ঠিক তেমনই এলোমেলোভাবে থরথর করে কাঁপছে।

এটা কি অশরীরী প্রভাবের ইশারা?

কিন্তু রমাশঙ্কর সেটা দেখেও তালির শব্দ করে হাত ঝাড়লেন। হেসে বললেন, 'আর্থকোয়েকের জন্যে আর্থের ভেতরের ডাইপোল নড়ছে...।'

পত্রলোচন ইতস্তত করে বললেন, 'আমি এসবের কোনও কারণ-টারন জানি না। শুধু এরকমটা মাঝে-মাঝে হয়, তাই জানি...।'

এমন সময় প্রিয়নাথ অদ্ভুত একটা ব্যাপার দেখতে পেলেন।

মোমের আলোয় যে-দেওয়ালটায় প্রিয়নাথের ছায়া পড়েছিল সেই দেওয়ালে কতকগুলো কালো ছায়া দিশেহারাভাবে ছুটে গেল।

সাদা পরদায় কালো সিলুয়েটের মতো ছায়াগুলো যেন কালো কার্ডবোর্ডের কাট আউট। ওরা বিদ্যুৎঝলকের মতো দেওয়ালের একদিক থেকে আর-একদিকে ছুটে চলে গেল। তার মধ্যে একটা ছায়ার যে মাথা নীচের দিকে, পা ওপরদিকে, সেটাও প্রিয়নাথ খেয়াল করলেন।

প্রিয়নাথ ভেবেছিলেন ব্যাপারটা আর কেউই লক্ষ করেনি।

কিন্তু ওঁর ধারণা যে ভুল সেটা বোঝা গেল মিংকি তেওয়ারির ভয়ংকর তীব্র চিৎকারে।

ওঁর চিৎকারটা কসাইয়ের চপারের কোপে মরণাপন্ন কোনও জন্তুর চিৎকারের মতো শোনাল। এ-চিৎকারে বুকের রক্ত পলকে হিম হয়ে যায়।

দেওয়ালের ছায়াগুলো একনিমেষেই উধাও হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ওদের আবির্ভাবের অভিঘাত প্রিয়নাথের মনে বলতে গেলে সিলমোহরের স্থায়ী ছাপ বসিয়ে দিয়ে গেল।

প্রিয়নাথের মনে হল, চপলকেতুর অন্তরালে যা কিছু রহস্য লুকিয়ে আছে তার ওপর থেকে পরদার আড়াল একে-একে সরে যাওয়ার ব্যাপারটা শুরু হয়েছে।

মিংকি তেওয়ারি তখনও ভাঙা কর্কশ গলায় চিৎকার করে যাচ্ছিল।

[প্রথম পর্ব সমাপ্ত]